১লা জানুয়ারী, ১৯৪৬

প্রকাশক : রবীন্দ্র নাগ
অপাঠ্য প্রকাশিকা : ৩৪এ, সুধীর চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মুদ্রক : জনসংযোগ প্রেস
৫৫এ, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৫

প্রিয় বান্ধবী

শ্রীমতী রূপমায়া দেবী'র

কোমল কর কমলে

শনি ঠাকুরের

শত বাণীর

প্রথম পর্ব

সমর্পণ

করলাম

রূপা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে চিঠি লিখে জানিও কেমন লাগল

ইতি

তোমাদের

শনি ঠাকুর

প্রকাশকের নিবেদন

বন্ধুবর 'শনি ঠাকুরের বাণী'র প্রথম পর্বের শত বাণীর অধিকাংশ বাণীই 'অপাঠ্য' মাসিক পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বাণীগুলি আমার ভাল লেগেছে। আশা করি বাংলার পাঠক পাঠিকাদেরও ভাল লাগবে। খারাপ লাগলে বন্ধুবর বলেছেন : 'শনি ঠাকুরের বাণী'র দ্বিতীয় পর্বের জন্যে আর কলম ধরব না। কোনদিন আর বাণীও শোনাব না। শুধু শুনব। আর স্মৃতি বিজড়িত কলমটা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব—শত আবর্জনার সঙ্গে কেমন ভেসে ভেসে চলবে—নিমতলার শ্মশান ঘাটে মুখাগ্নি শেষ করে আসা কান্নায় ভেঙে পড়া ঐ কিশোরটার পাশে চুপটি করে বসে বসে দেখব। দেখব ঐ আবর্জনা স্তূপের সঙ্গে সঙ্গে আমার কলমটাও কেমন ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দেখব কিশোরটাকে। যার কান্নাটা সবে থেমেছে—যার বিয়োগ ব্যথাটা অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। দেখব বাড়ীতে ফিরে এসে পাশের বাড়ীর সেই অন্তসত্ত্বা নব বধূটিকে। হয়তো আর একটা কলম দিয়ে লিখতেও বসব সদ্য ভূমিষ্ঠ এক নবজাতকের কাল্পনিক গল্প অথবা উপন্যাস।

রবীন্দ্র নাগ

পূর্বাভাষ

আমার অসংখ্য বান্ধব এবং বান্ধবী প্রায় প্রত্যেকদিনই আমাকে বলেন : শনি—বাণী শোনাও।

কিন্তু কিন্তু করলে সাধবান বাণী উচ্চারিত হয় : খবরদার, চর্বিত চর্বন নয়। কোনও মহাপুরুষের বাণীর কার্বন কপিও নয়। আমরা চাই—জগৎ জীবন আর মতবাদের ওপর খাঁটি নির্ভেজাল শনি ঠাকুরের বাণী। মতভেদ হোক। তর্কের তুফান ছুটুক। নিন্দের ঝড় উঠুক। কুছ পরোয়া নেই। তুমি বাণী শোনাও।

সভয়ে বলি : যদি কেউ মারধোর করে?

অনুরাগীর দল সাহস দিয়ে বলেন : আমরা আছি।

ভয়টা তখনও সম্পূর্ণ দূর হয় না। তাই বলি : যদি কেউ ছুরি দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে দেয়? বোমা ছুড়ে মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়? গুলি করে—

কথা অসমাপ্ত থেকে যায়। অনুরাগীর দল টেবিলে ঘুষি মেরে মরিয়া হয়ে বলেন : বলেছি তো, আমরা আছি। তোমার কোন ভয় নেই। তবে—

এবার মরিয়া ভাবটা কেমন যেন থিতিয়ে গেল। গলার সুরটাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়া : তবে—একান্তই যদি সে ধরণের কোন দুর্ঘটনা

আমাদের চোখের-আড়ালে ঘটে—জেনে রেখো, তার জন্যেও আমরা প্রস্তুত। মৃত্যুর পর তোমার স্মৃতিফলকে সোনার অক্ষরে লিখে রাখব—পৃথিবীর সকল বীরযোদ্ধার জীবন দীপ অকালে এইভাবেই নির্বাপিত হয়। এই স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ শনি ঠাকুরের অমৃতময় বাণী—"মানুষকে শুধু ভালবাসো আর মনুষ্যত্বকে রাজ সিংহাসনে বসাও"—আমাদের চিরদিনের পাথেয় হয়ে থাকল।

অনুরাগীদের কথা শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। ক্ষীণ কণ্ঠে শুধু প্রতিবাদ জানালাম: স্মৃতি ফলক আমার চাই না। মহাপুরুষ মহামানব মহাযোদ্ধা কিছুই হতে চাই না আমি। আমি চাই পরিপূর্ণ জীবনীশক্তি নিয়ে সাধারণ মানুষ হয়ে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করতে—শান্তিতে বেঁচে থাকতে। আমি চাই বাঁচতে।

আমার কথায় কর্ণপাত না করে ওরা ভারিক্কি চালে বলে: সব জিনিস চাইলেই পাওয়া যায় না। তাছাড়া তোমার প্রতিভা আছে—আমাদের নেই। আমাদের কর্তব্য তোমার প্রতিভাকে অমর করে রাখা। এতে তোমার নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়—যাক। কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু প্রতিভার অপমৃত্যু হলে দেশের ও দশের সমূহ ক্ষতি। আমরা বেঁচে থাকতে সে ক্ষতি কিছুতেই হতে দিতে পারি না। জেনে

শুনে সে ক্ষতি যদি আমরা মেনে নেই—কী জবাবদিহি করব আমরা উত্তরসূরীদের কাছে? তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা—আজ আর তুমি তোমার একার নও—আমাদের, জনসাধারণের, উত্তরসূরীদের, সকলের। প্রতিভা কখনো একক সম্পত্তি হতে পারে না। প্রতিভা সকল কালের, সকল দেশের, সকল মানুষের সম্পত্তি। এবং আমাদের কথা না শুনলে—তোমাকে আমরা "ঘেরাও" করব। কখন কি খাচ্ছ, কখন কার সঙ্গে কথা বলছ, কখন কি জামাকাপড় পরছ, কখন হাসছ, কখন কাঁদছ—সব আমাদের জানাতে হবে। আগেই বলেছি আজ আর তুমি তোমার একার নও। আমাদের, সকলের। এমন কি বাথরুমে অথবা ল্যাটট্রিনে স্নান অথবা প্রাতঃকৃত্য করতে গেলেও রেহাই পাবে না। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটির সব কথা আমাদের জানতে হবে—আরো পাঁচজনকে জানাতে হবে। এখন বল কি চাও—"ঘেরাও" না "মৃত্যু"? দুটোর মধ্যে একটা বেছে নাও।

"ঘেরাও" শব্দটি কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করল। দেহমন যেন ইলেকট্রিক শক লেগে চিন্‌চিন্ করে উঠলো। চোখের সামনে ভেসে উঠল "ঘেরাও"এর মর্মন্তুদ অসংখ্য কাহিনী চিত্র। প্রতিবাদ করবার—কিছু বিরুদ্ধে বলবার শেষ শক্তিটুকুও যেন কোন পালোয়ান এসে জোর

করে দাবিয়ে দিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, নির্ঝঞ্ঝাট "মৃত্যু"ই আমাকে বেছে নিতে হবে। বাণীই আমাকে দিতে হবে।

তাই ক্ষীণকণ্ঠে শুধু জানালাম : "মৃত্যু"।

আর সেই "মৃত্যু" দিয়েই শুরু করলাম 'শনি ঠাকুরের বাণী'র প্রথম পর্ব। ইচ্ছে আছে অদূর ভবিষ্যতে "জীবন" দিয়ে শেষ করব 'শনি ঠাকুরের বাণী'র দশম পর্ব অথবা শেষ পর্ব—অবিশ্যি ততদিন যদি সশরীরে বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকি।

শনি ঠাকুর

শনি ঠাকুরের বাণী

(প্রথম পর্ব)

০ এক ০

মৃত্যুর সংজ্ঞা আমার জানা নেই। মৃত্যু সুখকর না দুঃখকর—তাও জানি না। মৃত্যু 'শ্যাম' সমান—না 'শ্যাম সোহাগিনী' সমান—তাও আমার অজানা। প্রাণত্যাগের শেষ অনুভূতিটি কেমন—স্বর্গীয় না নারকীয়—তাও আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

শুধু কল্পনা করতে পারি—আমি মরে গেলাম, আমি চলে গেলাম পৃথিবী থেকে। বেঁচে থাকার সময়ের শত দুঃখ কষ্ট বেদনা যাতনা নিন্দা অপবাদ অভাব অনটন রোগ শোক ভয় ভাবনা অপরিতৃপ্ত কামনা বাসনা আর প্রবলের অত্যাচারে জর্জরিত এই ক্ষণস্থায়ী দেহটা শ্মশানভূমিতে চিরদিনের জন্যে ভস্মীভূত হয়ে গেল। একটা জীবন যন্ত্রণার শেষ হল। আর চিরচিনের অলিখিত আখরে লেখা হয়ে থাকল ক্ষনিক সুখ আশা আনন্দ সম্ভোগ ভাললাগা ভালবাসা আর প্রেমের অনির্বচনীয় অনুভূতির কয়েকটা মুহূর্তের আবেগ বিহ্বলতা—হয়তো কারো চোখের জলে,

কারো হৃদয়ের গোপনতম গভীরতম প্রশান্তিতে, কারো রোমাঞ্চিত দেহের শিহরণ পুলকে—যেখানে শুধু এই কথাটাই বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে—শনি একদিন আমাদের কত কাছে ছিল—আজ নেই। কত লক্ষ যোজন দূরে চলে গেছে সে। আর ফিরবে না। আর সে কোনদিন আমাদের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বসবে না। আর সে কোন বাণীও শোনাবে না। আর কোনদিন অভিযোগ করবে না। কোনদিন বলবে না—কি ভাল লেগেছিল আর কি ভাল লাগে নেই—কাকে ভাল লেগেছিল আর কাকে ভাল লাগে নেই। তাকে আর কোনদিন বলাও যাবে না—'শনি বাণী শোনাও'।

'শনিও আর কোনদিন কারো বাণী শুনবে না। মৃত্যু এসে শনিকে চিরদিনের জন্যে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে গেছে। শুধু নিয়ে যেতে পারে নি তার বাণীগুলো। আজো তা বেঁচে আছে—আর এই বাণীর মধ্যেই শনিকে আমরা দেখছি। তার হাসি কান্না সব। তার হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করছি প্রতিটি অক্ষরে, প্রতিটি কথায় আর প্রতিটি বাণীর মধ্যে। মৃত্যু সব নিয়ে যেতে পারে—পারে না শুধু নিয়ে যেতে শনি ঠাকুরের বাণীর মৃত্যুঞ্জয়ী দশটি পর্ব। শনির মৃত্যুহীন জীবন।'

০ দুই ০

একবার আমি জনৈকা বান্ধবীর শত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম।

বান্ধবীর প্রশ্ন : তোমাকে আজও বুঝতে পারলাম না। তুমি কার মতো?

স্বামী বিবেকানন্দের মতো?

আমার উত্তর : না।

প্রশ্ন : রামকৃষ্ণের মতো?

উত্তর : না।

—বুদ্ধদেবের মতো?

—না।

—যীশুখৃষ্টের মতো ?

—না।

—হজরত মহম্মদের মতো ?

—না।

—নানকের মতো ?

—না।

—কবীরের মতো ?

—না।

—তুলসীদাসের মতো ?

—না।

—জয়দেবের মতো ?

—না।

—চণ্ডীদাসের মতো ?

—না।

—বিদ্যাপতির মতো ?

—না।

—অরবিন্দের মতো ?

—না।

—রাধাকৃষ্ণনের মতো ?

—না।

—রবীন্দ্রনাথের মতো ?

—না।

—বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ?

—না।

—মধুসূদনের মতো ?

—না।

—শরৎচন্দ্রের মতো ?

—না।

—গিরিশচন্দ্রের মতো ?

—না।

—ডি, এল, রায়ের মতো ?

—না।

—ক্ষীরোদ প্রসাদের মতো ?

—না।

—দীনবন্ধুর মতো ?

—না।

—অমৃতলালের মতো ?

—না।

—রমেশ দত্তের মতো ?

—না।

—প্রমথ চৌধুরীর মতো ?

—না।

—সেক্সপীয়রের মতো ?

—না।

—বার্নাড শ'য়ের মতো ?

—না।

—ও'নীলের মতো ?

—না।

—মুকুন্দ দাসের মতো ?

—না।

—বিহারী লালের মতো ?

—না।

—রামপ্রসাদের মতো ?

—না।

—কৃত্তিবাসের মতো ?

—না।

—কাশীদাসের মতো ?

—না।

—শিশির ভাদুড়ীর মতো ?

—না।

—দানুবাবুর মতো ?

—না।

—দুর্গাদাসর মতো ?

—না।

—আব্দুল করিম খাঁর মতো ?

—না।

—লালচাঁদ বড়ালের মতো ?

—না।

—নগেন দত্তের মতো ?

—না।

—ভাতখণ্ডের মতো ?

—না।

—গুরুসদয় দত্তের মতো ?

—না।

—রাসবিহারী ঘোষের মতো ?

—না।

—গুরুদাস বাড়ুজ্জের মতো ?

—না।

—আশুতোষ মুখুজ্জের মতো ?

—না।

—শ্যামাপ্রসাদের মতো ?

—না।

—অতুল গুপ্তের মতো ?

—না।

—গান্ধীর মতো ?

—না।

—বি, সি, রায়ের মতো ?

—না।

—জওহরলালের মতো ?

—না।

—লালবাহাদুরের মতো ?

—না।

—কেনেডির মতো ?

—না।

—লিঙ্কনের মতো ?

—না।

—জর্জ ওয়াশিংটনের মতো ?

—না।

—লেনিনের মতো ?

—না।

—ষ্ট্যালিনের মতো ?

—না।

—হো চি মিনের মতো ?

—না।

—কামাল আতাতুর্কের মতো ?

—না।

—চার্চিলের মতো ?

—না।

—টাটার মতো ?

—না।

—বিড়লার মতো ?

—না।

—ইস্পাহানির মতো ?

—না।

—আকবরের মতো ?

—না।

—রাণা প্রতাপের মতো ?

—না।

—শিবাজীর মতো ?

—না।

—সিরাজের মতো ?

—না।

—চন্দ্রগুপ্তের মতো ?

—না।

—চাণক্যের মতো ?

—না।

—অশোকের মতো ?

—না।

—কার্ল মার্কসের মতো ?

—না।

—গোর্কীর মতো ?

—না।

—শেখভের মতো ?

—না।

—এজরা পাউণ্ডের মতো ?.

—না।

—জেমস্ জয়েসের মতো ?

—না।

—নজরুলের মতো ?

—না।

—সুকান্তের মতো ?

—না।

—সি. আর, দাশের মতো ?

—না।

—সুরেন্দ্র নাথের মতো ?

—না।

—তিলকের মতো ?

—না।

—অবনীন্দ্রনাথের মতো ?

—না।

—নন্দলালের মতো ?

—না।

—ব্রজেন শীলের মতো ?

—না।

—হীরেন দত্তের মতো ?

—না।

—বিপিন পালের মতো ?

—না।

—বিনয় সরকারের মতো ?

—না।

—লোহিয়ার মতো ?

—না।

—এম, এন, রায়ের মতো ?

—না।

—নির্মল চন্দ্রের মতো ?

—না।

—মলিনী সরকারের মতো ?

—না ?

—বিদ্যাসাগরের মতো ?

—না।

—রামমোহন রায়ের মতো ?

—না।

—জগদীশ বসুর মতো ?

—না।

—মেঘনাথ সাহার মতো ?

—না।

—বাল্মিকীর মতো ?

—না।

—বেদব্যাসের মতো ?

—না।

—মহাদেবের মতো ?

—না।

—গণেশের মতো ?

—না।

—কার্তিকের মতো ?

—না।

—রামের মতো ?

—না।

—যুধিষ্ঠিরের মতো ?

—না।

—অর্জুনের মতো ?

—না।

—শ্রীকৃষ্ণের মতো ?

—না।

—তবে তুমি কার মতো ?

—আমি আমার মতো। আমি শনি ঠাকুরের মতো। মহাপুরুষ নই, ভগবানও নই। দোষে গুণে ভালয় মন্দয় মেশানো একজন সাধারণ বুদ্ধিজীবি মানুষ। গরীবও নই, বড়লোকও নই—মধ্যবিত্ত। উচ্চ শিক্ষিত নই, অশিক্ষিতও নই—মাধ্যমিক শিক্ষিত। সুষ্ঠুভাবে সমাজ জীবন যাপন করবার জন্যে গরীবের সাহায্য চাই, বড়লোকেরও সাহায্য চাই। মনুষ্যত্বহীন কাজ বড়লোক বা গরীব—যেই করুক না কেন—মনে ভীষণ দুঃখ পাই। ভাল কাজ করলে কৃতজ্ঞতা জানাই—আপনার করে কাছে টেনে নিই, ভালবাসি, সুখে দুঃখে সঙ্গ দিই—সঙ্গ কামনা করি। মহাপুরুষ আর সাধারণ মানুষ—বড়লোক আর গরীব—পণ্ডিত আর অ-পণ্ডিত—ধার্মিক আর অধার্মিক—সকলের সান্নিধ্যই আমার প্রিয়। সমাজে যারা ঘৃণিত, দূষিত, নিন্দিত, উপহাসিত—তাদের মর্মবেদনা বোঝবার চেষ্টা করি। আবার তেমনি অনুধাবন করবার চেষ্টা করি

সমাজে যারা সম্মানিত পরিশুদ্ধ, অভিনন্দিত, উল্লসিত তাদেরও মর্মযাতনা। কোন মানুষই যেন জীবন নিয়ে সুখী নয়। কি যেন এক অতৃপ্তি, কি যেন এক ফাঁক থেকে গেছে জীবনের প্রতিটি পরিচ্ছেদে। সেটা বোঝবার চেষ্টা করি আমারই মন দিয়ে, ভগবানের মন দিয়ে নয়—মহাপুরুষের মন দিয়ে নয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের মন দিয়ে। সেই সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষটাই শনি ঠাকুর। তাই আমি চাই না কারো মতো হতে। আমি চাই আমারই মতো হয়ে উঠতে—শনি ঠাকুরের মতো হয়ে উঠতে।

o তিন o

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পরিপূর্ণ রূপায়নে যে সব অন্তরায়গুলি প্রতিনিয়ত আমাদের একতার শক্তিকে খর্ব করছে—যে সব কুশ-কণ্টকের জ্বালা প্রতিদিন আমরা অনুভব করছি, সেগুলি একত্র সাজালে একটি বৃহৎ আধুনিক সপ্তকাণ্ড "রাবনায়ণ" রচিত হতে পারে। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'রাবনায়ণে'র সেই সাতটি কাণ্ডকারখানা যদি জনমত গঠন করে, আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়—তাহলে বিশুদ্ধ সমাজবাদী 'রামায়ণ' রচনার কাজ সহজতর হবে।

'রাবণায়ণে'র সেই সাতটি কাণ্ডকারখানা নিম্নরূপ :

১ম কাণ্ড : পৈতে।

এটাকে বলা যেতে পারে সমাজবাদের ভেদবমি। মানুষে মানুষে ভেদ-সৃষ্টির এতবড় হাতিয়ার মনে হয় তামাম পৃথিবীতে আর আবিষ্কৃত হয়নি। স্বপ্ন দেখলাম : পৈতেধারী একটি পুঁচকে ছেলে বড়দের মতো গলার স্বর করে বলছে : জন্ম থেকেই আমাকে

অপৈতেধারীদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে হবে। মরলেও আমার আলাদা ব্যবস্থা—শ্মশানভূমিতে শূদ্র-চিতার বেশ খানিকটা তফাতে পৈতে-চিতা আছে। শূদ্র-চিতার ছোঁয়া বাঁচিয়ে পৈতে-চিতাতেই আমাকে দাহ করা হবে। অনভিজ্ঞ কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বৃথাই 'শ্রীকান্তে' ইন্দ্রের মুখ দিয়ে শ্রীকান্তকে শুনিয়েছেন : মরলে আবার জাত থাকে নাকিরে ? শরৎচন্দ্র যদি সত্যিকারের বাস্তব-বাদী অভিজ্ঞ সাহিত্যিক হতেন তাহলে লিখতেন : এদেশে মরলেও জাত থাকে। এদেশে মরলেও মানুষ দু'রকমের ভূত হয়ে জন্মায়। এক—পৈতে-ভূত ; দুই—শূদ্র-ভূত। তবে রক্ষে এই যে পৈতে-ভূত ভুলেও জ্যান্ত শূদ্রের ঘাড় মটকায় না—কারণ জ্যান্ত শূদ্রকে ছুঁলে পৈতে-ভূতের জাত যাবে। ওরে সর্বনাশ। এমন কর্ম নৈব নৈব চ।

২য় কাণ্ড : আপনি / তুমি / তুই।

এটাকে বলা যেতে পারে সমাজবাদের শ্রেণী-সংগ্রাম। স্বপ্ন দেখলাম : আমরা সব সাহেব হয়ে গেছি। ইংরাজি *You* শব্দটা একমাত্র 'তুমি'তে তর্জমায়িত হয়েছে এবং অফিসের কেরানী বড়বাবুকে বলছে : বড়বাবু, তুমি আমাকে ডেকেছিলে ? বড়বাবু বেশ হাসিখুশি ভাবেই উত্তর দিচ্ছেন : তুমি আজকাল প্রায়ই লেট করে আসছ মনোতোষ। কেরানী : তুমিত জান বড়বাবু, আজকাল ট্রাম বাসের কি সাংঘাতিক অবস্থা। বড়বাবু : তুমিই আমাকে ডোবাকে মনোতোষ।

৩য় কাণ্ড : পদমর্যাদা / খেতাব / ডিগ্রীবাজী।

এটাকে বলা যেতে পারে সমাজবাদের ট্রাপিজের খেলা। সাধারণ দর্শকের তাক লেগে যায় পদমর্যাদা, খেতাব আর ডিগ্রী-বাজীদের এ খেলা দেখে। স্বপ্ন দেখলাম : ফরমান জারি হয়েছে —হাইয়ার সেকেণ্ডারী বা সমতুল্য মাপকাঠিটাই সকলের ক্ষেত্রে

শিক্ষার হাই জাম্পের শেষ মাপকাঠি। যে উত্তীর্ণ হতে না পেরে ডিগবাজী খাবে, তার হাতে দেওয়া হবে একটি আমপাতা। আর যে উত্তীর্ণ হবে, তার হাতে দেওয়া হবে দুটি আমপাতা। কোন পদমর্যাদামূলক খেতাব বা ডিগ্রি কাউকেই দেওয়া হবে না।

৪র্থ কাণ্ড : এক ভাষাভাষী রাষ্ট্রভাষা।

এটাকে বলা যেতে পারে সমাজবাদের কালোবাজার। আর এই কালোবাজারের নিয়ন্ত্রণ কর্তা একজন জবরদস্ত ডিক্টেটর। স্বপ্ন দেখলাম : বহু ভাষাভাষীরা হামলা করছেন : আমাদের মাতৃভাষাগুলিকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক। সুইজারল্যাণ্ডের চেয়ে আমাদের দেশ অনেক অনেক বড়। এখানে অন্তত সুইজারল্যাণ্ডের চারগুণ বেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হোক। এতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

৫ম কাণ্ড : অতিরিক্ত কাঞ্চন।

এটাকে বলা যেতে পারে সমাজবাদের ক্যানসার। সমাজ-দেহের বিশেষ একটি অঙ্গ এ রোগে আক্রান্ত হলে, খুব বেশীদিন সমাজবাদকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। স্বপ্ন দেখলাম : মুষ্টিমেয়র হাতকে অতিরিক্ত কাঞ্চনশূন্য করবার জন্যে সরকারী অফিসারদের অর্থাৎ প্রখ্যাতা বিদুষী সুন্দরা বুদ্ধিমতী নব উদ্ভিন্না যৌবনা কামিনীদের নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের কাজ ছলনা আর প্রগলভতায় অতিরিক্ত মেদবহুল কাঞ্চনবাবুদের মুগ্ধ করা, কিছুটা অকিঞ্চন করা এবং সমাজে রক্ত বিপ্লব না ঘটিয়ে ধনসাম্য রক্ষা করা।

৬ষ্ঠ কাণ্ড : বিভিন্ন ধর্ম।

এটাকে বলা যেতে পারে সমাজবাদের টাগ অব ওয়্যার।

সমাজবাদ এক পা অগ্রসর হতে চাইলে ওদিক থেকে টান পড়ে। এদিকে নানান মতের ও পথের ধার্মিক পালোয়ান—ওদিকে নানান মতের ও পথের অধার্মিক পালোয়ান। ; কখনও বাঁদিকে এক হাত এগিয়ে আসছে—কখনও ডানদিকে এক হাত এগিয়ে আসছে। ছ'দিকের পালোয়ানদের জোর প্রায় সমান সমান। স্বপ্ন দেখলাম : কোটি কোটি হ্যাণ্ডবিল ছড়ানো হচ্ছে : রাষ্ট্র একমাত্র "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নেই।" এই নীতি মেনে নিয়ে মানুষ মানুষ-ঠাকুর ছাড়া আর কোন ধর্মীয় ঠাকুর বা ঈশ্বরের ভজনা করবে না।

৭ম কাণ্ড : একনায়কতন্ত্র।

এটাকে বলা যেতে পারে সমাজবাদের ছেলেধরা অথবা মেয়েধরা। অল্পবুদ্ধির সরল চমকপ্রিয় নাবালক বা নাবালিকারাই এই ছেলেধরা বা মেয়েধরাদের শিকার। স্বপ্ন দেখলাম : কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন সজাগ শিক্ষিত মার্জিত ভদ্র প্রগতিশীল সাবালক সাবালিকারা ধ্বনি তুলছেন : আমরা সব সমাজবাদী। আমাদের দাবী মানতে হবে—আমরা চাই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ। আমরা মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রগতি, সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধির উপাসক। আমরা চাই গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী, একটি নয়—ছটি নয়—একশো নয়—ছশো নয়—হাজার হাজার ছোট মাঝারী বড় দল, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, পার্টি। আমরা চাই পূর্ণ গণতান্ত্রিক সমাজবাদ।

০ চার ০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পাঠ করে এই ধরণের কথা কোথাও খুঁজে পাইনি যে তুমি সংসারী হয়ো না। তুমি সর্বত্যাগী সংসার বিবাগী হয়ো। স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিজনদের ভুলে যেয়ো। তুমি

ইহকালে কোন কর্তব্য না করে শুধু পরকালের চিন্তায় মালাজপ করো। কামনা বাসনা সব পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন যাপন করো। তুমি শুধু সৎসঙ্গে বাস করো, শুধু সদগ্রন্থ পাঠ করো। সিনেমা থিয়েটার দেখো না, রেডিও শুনো না, নটনটীদের নিয়ে হৈ চৈ করো না। তুমি শুধু সাত্বিক আহার করো—ভুলেও রাজসিক আহার করো না—ভুলেও কারণবারি পান করো না। তুমি শুধু বৈষ্ণবীয় রীতিনীতি পালন করো. ভুলেও শাক্ত রীতিনীতি পালন করো না। কৌপীনধারী অথবা গেরুয়াধারী শুধু হয়ো, ভুলেও কোট প্যাণ্ট টাই জুতো মোজা সার্ট পানজাবী অপরপক্ষে রঙবেরঙের শাড়ী ব্লাউজ হাল ফ্যাসনের বক্ষাবরণী পরিধান করো না অথবা মনের আনন্দবিধায়ক হেজলিন, স্নো, পাউডার, ক্রীম, নেলপালিশ, লিপষ্টিক ব্যবহার করো না।

এসব কথা কোথাও তিনি বলেন নি। তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার সারমর্ম : সাধারণ সংসারী মানুষ যা করে, তুমিও তাই কর। সংসার করবে বৈকি। রুচি অনুযায়ী আহার বিহার বিলাস ব্যাসন করবে বৈকি। জীবনের পূর্ণাঙ্গ শ্রীবৃদ্ধির জন্যে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গের কোন বর্গটিকে বাদ দিলে চলবে না। কিন্তু সাবধান। কিছুতে জড়িয়ে পড়লে চলবে না। পাঁকাল মাছের মতো থাকতে হবে। যখন ডাঙ্গায় উঠবে তখন আশক্তির জল যেন গায়ে এক ফোঁটাও লেগে না থাকে। সবই তো উপলক্ষ্য —লক্ষ্য শুধু একটি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্। কে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্? ঈশ্বর। সব কিছু করবে, কিন্তু ঐ ঈশ্বরে মনটি যেন পড়ে থাকে। সংসারী হয়েও যে এটা পারে সেই তো বাহাদুর। সাধু সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরের ধ্যান করবে এর মধ্যে বাহাদুরীর কি আছে?

০ পাঁচ ০

আধুনিক ভারতের ব্যাভিচারিনী মেয়েরা সবচেয়ে বড় মদৎ পেয়েছেন মহাভারতের 'দ্রৌপদী' চরিত্র থেকে। আমি কোন পিতামাতাকে নিজের কন্যার 'দ্রৌপদী' নাম রাখতে শুনিনি। যদি কেউ রেখে থাকেন বুঝতে হবে 'মহাভারত' তিনি মন দিয়ে পড়েন নি। আর যদি পড়ে থাকেন, বুঝতে হবে নিজের অবদমিত উদগ্র যৌনাকাঙ্খার প্রতিফলন দেখতে চান নিজের কন্যার মধ্যে।

০ ছয় ০

প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় :

'ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির এক কথায় উত্তর কি ?'

যত বলি : 'এক কথায় এমন দুরূহ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়'—ততই মিনতি, অনুরোধ, তাগিদ।

অগত্যা আমাকে অনুরোধে ঢেঁকি গিলতেই হয় :

'এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে—তোমাকে প্রথমে 'ভারতীয়' হতে হবে। তারপর 'সভ্য' হতে হবে, 'সুংসস্কৃত' হতে হবে, 'অর্থ' উপার্জন করতে হবে, 'কাম' চরিতার্থ করতে হবে। 'ধর্ম' জীবন যাপন করতে হবে—'মোক্ষ' লাভ করতে হবে। এই ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সুবিশাল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি।'

০ সাত ০

'মেজরিটি'—'মাইনরিটি'র এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব চলেছে বর্তমান ভারতে। যেহেতু আমি 'মেজরিটি' দলের লোক, সেইহেতু আমার মত তোমাকে মানতে হবে, আমার পথে তোমাকে চলতে হবে, আমার খারাপকে তোমাকে ভাল বলতে হবে। নইলে তোমাকে ভয় দেখাব, তোমাকে নিন্দে করব, বদনাম রটাব—এক কথায় তোমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলব। এবং এতেও যদি তুমি কব্জা না হও, তবে তোমার গর্দান নেব। মোদ্দা কথা, তোমাকে ছলে বলে কৌশলে আমাদের মেজরিটি দলে ভিড়িয়ে দেব। মনে রেখ আমরা কমিউনিষ্ট। আমাদের জগদগুরু কার্ল মার্কস। তিনি যা বলে গেছেন সব বেদবাক্য। মার্কসের চেয়ে পৃথিবীতে আর বড় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেননি বা আর কোনদিন করবেন না। তাঁর পাণ্ডিত্যের কাছে ভারতীয় পণ্ডিতেরা, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, এব্রাহাম লিঙ্কন কিছুই নন। ঈশ্বর শুধু একটিমাত্র পণ্ডিতকেই জীবন আর জগৎ সম্পর্কে শেষ কথা বলবার অধিকারী করে পাঠিয়েছিলেন। তুমি যুক্তি দেখাবে—ওসব আমরা মার্কসীয় চেলা চামুণ্ডার দল (যাদের বিদ্যেবুদ্ধি মার্কসের বিদ্যেবুদ্ধির প্রতিভার সহস্রাংশের এক অংশও নয়) মানি না। তুমি পৃথিবীর আরো অনেক পণ্ডিতদের বাণী শোনাবে, ওসব আমরা শুনি না। আমরা মার্কসীয় দর্শনের শৃগাল। আমরা জানি শুধু বিচার বুদ্ধি বিবেচনা কাণ্ডজ্ঞানহীন শ্লোগানের হুক্কা হুয়া করতে সমবেত স্বরে সন্ধ্যায় যখন অভাব অনটন দারিদ্র বেকারত্ব অসহায়তার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে পৃথিবীতে। তুমি আমাদের নিন্দে করবে, ভৎর্সনা করবে, গালিগালাজ দেবে—ওসব বাক্যবাণ আমাদের গায়ে বিঁধবে না; তোমার চেয়ে গায়ের চামড়া আমাদের অনেক পুরু। সার কথা,

বক্তিগতভাবে তুমি আমাদের কাছে কিছু নও। তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছা আমাদের কাছে কিছু নয়। তোমার স্বধর্ম, রীতিনীতি, মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের কথা, ব্যক্তি স্বাধীনতার কথার বুর্জোয়া মানে আমাদের প্রোলেটেরিয়েট অভিধানে লেখা নেই। আমরা শুধু বুঝি আমরা হচ্ছি 'মেজরিটি'র রাঘব বোয়াল। ছোট মাঝারী মাছকে এক নিঃশ্বাসে গলধঃকরণ করব, 'মাইনরিটি' দলকে পোলারাইজেশনের যাঁতাকলে ফেলে গুঁড়িয়ে পিষিয়ে একাকার করে দেব। আর দেখাব অদূর ভবিষ্যতে সকল সমালোচনা যুক্তি তর্কের উর্ধে একেবারে নিখুঁত একটিমাত্র তিলোত্তমা সদৃশ রাজনৈতিক দল তামাম হিন্দুস্থানে মোড়লী করছে। তার যদিও কিছু খুঁত থাকে, তা থাকবে লৌহ যবনিকার অন্তরালে। সেখানকার প্রকৃত চিত্র কি স্বয়ং ঈশ্বরও তা বলতে পাবেন না—মানুষ তো কোন ছার। সেখানে কি ঘটে অতি বড় জল্লাদেরও তা জানবার উপায় নেই। অপপ্রচারের ঢক্কা নিনাদে কোনদিন শুনতেও পাবে না সেই লৌহ যবনিকার অন্তরালে কার বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে, কার অভিশপ্ত জীবন দুবিসহ বেদনায় প্রতিবাদহীন হয়ে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা 'মেজরিটি'—আমরা সর্বশক্তিমান। আমাদেরই আধিপত্য সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত হবে, এই আমাদের শেষ ফতোয়া।

চমৎকার যুক্তি এই 'মেজরিটি'ওয়ালাদের। শোনা যাচ্ছে এই সংখ্যানুপাতিক ধ্রুব যুক্তির ওপর নির্ভর করে হিন্দী সিনেমার দর্শকরাও বলতে শুরু করেছেন : সমগ্র ভারতের ফিল্মী দর্শক হিসেবে আমরাই 'মেজরিটি'। আমাদেরই ফতোয়া 'মাইনরিটি' দর্শকদের মানতে হবে, হিন্দী সিনেমা দেখবে হবে। নইলে 'মাইনরিটি'র গর্দান নেব। মোদ্দা কথা, 'মাইনরিটি'কে ছলে বলে কৌশলে 'মেজরিটি'র দলে ভিড়িয়ে দেব।'

এই অকাট্য যুক্তির ওপর নির্ভর করে ভারতের ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত এক বিরাট দল বলতে শুরু করেছেন : আমরাই 'মেজরিটি'।

আমাদেরই পোষাক 'মাইনরিটি'কে পরতে হবে, নইলে গর্দান নেব।

হিন্দীভাষাভাষিদেরও সেই একই বুলি : ভারতের 'মেজরিটি'র ভাষায় আমরাই কথা বলি, হিন্দী ভাষাই 'মাইনরিটি'কে বলতে হবে। নইলে গর্দান নেব।

বেকারদেরও সেই একই অভিযোগ : আমরাই ভারতে 'মেজরিটি'। আমাদের রকবাজি 'মাইনরিটি'কে মানতেই হবে। নইলে গর্দান নেব।

হিন্দুদেরও সেই একই প্রত্যাশা : ভারতে আমরাই 'মেজরিটি'। আমাদের ধর্মই 'মাইনরিটি'কে মানতে হবে। নইলে গর্দান নেব।

অশিক্ষিতদেরও সেই একই আবদার : ভারতে 'মেজরিটি' আমরাই। 'মাইনরিটি'র শিক্ষার আলোক আমাদের দাবীতেই নিবিয়ে দিতে হবে। নইলে গর্দান নেব।

ঘুষখোর, কালোবাজারী, গুণ্ডা, অলস কেরানী, শ্রমিক, কৃষক সকলেরই সেই একই শ্লোগান : আমরাই ভারতে 'মেজরিটি'। আমাদের ফতোয়াই 'মাইনরিটি'কে মানতে হবে। তাদেরও আমাদের মতো হতে হবে। নইলে গর্দান নেব।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জানালাটা খুলে গেল। পাশের বাড়ীর ছেলেটা চীৎকার করে পড়ছে :

'দুর্জনেরে রক্ষা করো দুর্বলেরে হানো
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।'

কানে লাগল। বললাম : খোকন তুমি ভুল পড়ছ। ও জানালা থেকে খোকন উত্তর দিল : না জ্যাঠা (মশাই)—ঠিকই পড়ছি। আপনারা পড়েছেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীয় সংস্করণ আর আমি পড়ছি রবীন্দ্রনাথের মার্কসীয় সংস্করণ। আচ্ছা চলি—লাল সেলাম।

ছোকরার কথা শুনে আমি তো থ।

০ আট ০

প্রায় প্রত্যেকদিনই আমাকে একটি জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে : আপনি অহিংসাকে সমর্থন করেন, না হিংসাকে ?

আমি বলি : 'অহিংসা, হিংসা দুটিকেই আমি সকর্থন করি। আমি নিরামিষ ও আমিষভোজী।'

তবু জিজ্ঞাসা : 'অহিংসাকে সমর্থন করেন বুঝতে পারি। কিন্তু হিংসাকে কেন ?'

আমি বলি : আমার মাত্র দশটি প্রশ্নের জবাব আজও সঠিক-ভাবে পাইনি বলে।

জিজ্ঞাসা : কি সেই দশটি প্রশ্ন ?

আমি বলি : (১) ভারত রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে—অহিংসসেবী অস্ত্র ধারণ করবে না ?

(২) দুষ্কৃতকারী সমাজবিরোধীরা একত্র হয়ে হিংসাত্মক কার্য-কলাপে লিপ্ত থাকলে, অহিংসসেবী হিংসার পথ অনুসরণ করবে না ?

(৩) হিংস্র বন্য পশুরা জনপদে হানা দিয়ে সভ্যমানব সমাজকে অতিষ্ঠ করলে, অহিংসসেবী রাইফেলটা উঠিয়ে ধরবেন না—গুলি করবেন না ?

(৪) চোখের উপর কোন দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানবরূপী নর-রাক্ষস নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা, ধর্মান্তিকরণ, সম্পত্তি লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, গুলি-বোমা-ধনুক নিক্ষেপন, ধারাল অস্ত্রাদি পরিচালন প্রভৃতি বর্বরোচিত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হতে দেখেও অহিংসসেবী সহিংসসেবী হবেন না ?

(৫) প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের হুমকি দেখালে ভারতভূমির অহিংসসেবী সুসন্তানগণ মুখে শুধু শান্তির ললিত বাণী শোনাবেন—না, সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত হবেন ?

(৬) ধর্মের নামে, জাতীয়তার নামে, বিশেষ কোন জাতীয় প্রথার নামে, বিশেষ কোন জাতীয় উৎসবের নামে হিংসাত্মক আক্রমণ চালালেও—অহিংসসেবী আত্মরক্ষার নিম্নতম প্রয়োজনেও হিংসার শরণাপন্ন হবেন না ?

(৭) অনুপকারী, অকল্যাণকারী, অহিতকারী, অনর্থকারী, রোগ সৃষ্টিকারী কীট পতঙ্গ প্রাণীকূল থেকে মানব গোষ্ঠিকে রক্ষা করবার জন্যেও কি অহিংসসেবী হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকবেন না ?

(৮) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োজনে, রাজনৈতিক দলের বিশেষ মতবাদ পোষণ করার প্রয়োজনে, বিশেষ কোন জাতীয় বৃত্তির সংরক্ষনের প্রয়োজনে, বিশেষ কোন ধর্মীয় নেতার নির্দেশনামা মান্য করার প্রয়োজনে, সরকারী পুলিশ বিভাগকে সশস্ত্র আক্রমণের নির্দেশদানের প্রয়োজনে, গৃহযুদ্ধ দমন করার প্রয়োজনে, সৈন্যকে তার যথাযথ কর্তব্য পালন করবার প্রয়োজনে—অহিংসসেবী কি হিংসাকে 'অভিশাপ' না বলে 'আশীর্বাদ' বলে গণ্য করবেন না ?

(৯) ভয়াবহভাবে বর্ধিত জন্মহার নিয়ন্ত্রনের জন্যে প্রয়োজন-বোধে অহিংসসেবী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে রমনীর গর্ভস্থ সপ্রাণ-ডিম্বকে অথবা পুরুষের সপ্রাণ বীর্যকে একত্র মিলিত হতে না দিয়ে ভ্রুণের সৃষ্টি রোধ করার জন্যে কি তুটি পৃথক প্রাণ কণিকাকে হত্যা করবেন না ?

(১০) চরম অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কি অহিংসসেবী সমর্থন করবেন না ?

প্রশ্ন শেষ হলে আমি সমবেত সুধীমণ্ডলীকে জিজ্ঞেস করলাম : 'পারবেন আমার এই প্রশ্নগুলির সঠিক জবাব দিতে ?'

'ভেবে দেখি—পরে জানাব'—এই বলে সকলেই ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আমার মনে হল সবাই যেন পালিয়ে গেলেন। আমার মনে হল সবাই যেন আমার প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেলেন। আমার মনে হল 'এমন কাঠখোট্টা প্রশ্ন করলে—আর কোনদিন

তোমার মুখদর্শন করব না'—এমনি একটা মনোভাব নিয়ে সবাই যেন গা ঢাকা দিলেন।

আমি রেডিওর চাবিটা ঘুরিয়ে দিলাম। সমবেত কণ্ঠের সংগীত ভেসে এল : 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি,—নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব।'

রাত্রি তখন দশটা দশ।

০ নয় ০

পৃথিবীতে যাঁর কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল মনুষ্যত্ব দেবত্বের চেয়ে বড় ; সর্ব সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা জীবন সাধনা ; সর্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম মানব ধর্ম ; সর্ব শক্তির শ্রেষ্ঠ শক্তি প্রেম, ভালবাসা, সেবা ; সর্ব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ ধনী নির্ধন জাতি ধর্ম উচ্চ নীচ ভেদাভেদহীন মানব কল্যাণ—তাঁর নাম শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত। মানবতার কল্যাণ সাধনে যিনি স্বর্গকে অস্বীকার করে নরকে যেতেও প্রস্তুত ছিলেন—তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ।

সুদীর্ঘ জীবন লাভ না করেও স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীতে নব চেতনার যে আলোক বর্তিকা প্রজ্বলিত করে গেলেন—আজও তা অনির্বান। এ প্রদীপ কোনদিন নিভবে না—সভ্যতার সংকটের যত ঝড়ই উঠুক না কেন। অল্প পরিসরের জীবন দিয়ে তিনি মানব সেবার যে আদর্শ প্রচার করে গেলেন তার মর্মার্থ :

ঈশ্বরকে পেতে হলে তোমাকে মানুষের সেবা করতে হবে—মানুষকে ভালবাসতে হবে। দুঃখ দারিদ্র রোগ শোক ভয় ভাবনা হিংসা অকল্যাণের হাত থেকে মুক্ত হতে গেলে—তোমাকে মানুষের সেবা করতে হবে—মানুষকে ভালবাসতে হবে। কৃষ্টি সভ্যতা মনুষ্যত্ব আদর্শ আর শান্তিকে চিরদিনের জন্যে রক্ষা করতে গেলে—তোমাকে মানুষেরই মাঝে সত্য শিব আর সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। মানুষকে বাদ দিয়ে সত্যকে পাওয়া যায় না। মানুষকে বাদ দিয়ে

ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মানুষকে বাদ দিয়ে সুন্দরকে পাওয়া যায় না। আর এই মানুষ তুমি-আমি ; ধনী-দরিদ্র ; পণ্ডিত-মুর্খ ; বিজ্ঞ-অজ্ঞ ; উচ্চকুলোদ্ভব-মুচি ; বর্ণশ্রেষ্ঠ-মেথর—সকলেই। এই সবকালের : সর্বদেশের মানুষের কোন জাত নেই—কোন শ্রেণী নেই—কোন সংস্থা নেই—কোন দ্বন্দ্ব নেই—কোনো সংঘাত নেই। প্রকৃত জাত শ্রেণী সংস্থা দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের বিষ দাঁতগুলো হচ্ছে হিংসা দ্বেষ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। সেগুলো উপড়ে ফেলতে হবে —নির্মম হতে হবে—শক্তির উপাসনা করতে হবে তোমাকে। এইসব আপদগুলো চলে গেলে দেখবে মানুষ পৃথিবীটাকে অসুন্দর করছে না ; জীবনটাকে বর্বর করে তুলছে না ; মানুষকে হিংসা করছে না ; ঘৃণা করছে না। দেখবে সারা জগৎ জুড়ে মানুষ এক জাতি, এক প্রাণ, অভিন্ন ! পৃথিবীটা শান্তির নিকেতন। জীবনটা ভালবাসার নব অরুণোদয়।

O দশ O

রবীন্দ্রনাথ। সমগ্র পৃথিবীর এক পরম বিস্ময়। সমগ্র শুভ, শুচি, সুন্দর আর কল্যাণের এক নতুন দিগন্ত। সমগ্র বিশ্বজনীন মানবতার আর মহত্বের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। সমগ্র বিশ্ব মানব সভ্যতার পরিপুর্ণতার দিকে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সমগ্র ভারতীয় শিক্ষা আর সংস্কৃতির এক অবিস্মরনীয় প্রগতিশীল ভাষ্যকার। সমগ্র বাঙালীয়ানার এক মহা নব জাগরণের পথিকৃৎ।

রবীন্দ্রনাথেরই বাণী : 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' মানুষকে ছেড়ে—এই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শে ভরা সুন্দর জীবন আর জগৎটাকে ছেড়ে যেতে চাই না আমি। আমি বলতে চাইনা : 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব।' আমি বলতে চাই : 'নিত্য

তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে, তার মধু কেন মন মধুপে খাওয়াও না।' আমি বলতে চাই : 'আজ কোন কাজ নয়। সব ফেলে দিয়ে ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থগীত, এসো তুমি প্রিয়ে, আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার, কবিতা কল্পনা-লতা। শুধু একবার কাছে বসো। আজ শুধু কূজন গুঞ্জন তোমাতে আমাতে, শুধু নীরবে ভুঞ্জন এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা।' আমি বলতে চাই : 'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতিহার, কত রূপ ধরে পরেছ গলায়, নিয়েছ সে উপহার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।' আমি বলতে চাই : 'অধরের কোনে যেন অধরের ভাষা, দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে। গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালবাসা, তীর্থ-যাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।'

রবীন্দ্রনাথেরই বাণী : 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' সুখে দুঃখে, আলোয় অন্ধকারে, আশা নিরাশায় ভরা সংসার, সমাজ, জীবন আর জগৎকে যে হতভাগ্য দেখতে পেল না, সেই শুধু করবে মুক্তির সাধনা আর কাতর স্বরে বলবে—জগৎ মায়া, জীবন অনিত্য—দারা পুত্র পরিবার কেউ তোমার নয়, তুমিও কারো নও। কিন্তু আমি বলব : 'কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা, তারি মধ্যে চির জীবন বইব গানের ডালা।' আমি বলব : 'দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে, ডাইনে বায়ে।' আমি বলব : 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাকনা, মন উড়েছে উড়ুক নারে মেলে দিয়ে গানের পাখনা।' আমি বলব : 'জীবন খাতার অনেক পাতাই এমনি তরো শূন্য থাকে, আপন মনের খেয়াল দিয়ে পূর্ণ করে লওনা তাকে।'

রবীন্দ্রনাথেরই বাণী : 'ধন নয়, মান নয় শুধু ভালবাসা, করেছিনু আশা।' প্রচুর অর্থ, প্রভূত সম্মান, প্রবল প্রতিপত্তি—এসব কিছুই চাইনা আমি। আমি চাইনা সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীন মানুষগুলিকে একটি ভাবের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে—শুধু একজনেরই

প্রভুত্ব বিস্তার করতে। বিশ্ব পুণ্যতীর্থে নানান পথের মানুষ, নানান মতের মানুষ এসে মিলিত হোক—মঙ্গল কলস ভর্তি করুক —শান্তির বারি সিঞ্চন করুক হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে। মানুষে মানুষে ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হোক। জীবন আরো সুন্দর হোক। পৃথিবী আরো মধুময় হোক। শেষ বিদায়ের দিনেও যেন বলে যেতে পারি : 'হে মহাপৃথিবী, হে মহাজীবন, হে মহামরণ—আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে।' আবার ফিরে এসে যেন বলতে পারি : 'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব।' আবার যেন বলতে পারি : 'একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি, তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।' আবার যেন বলতে পারি : 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী, হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী।' আবার যেন বলতে পারি : 'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে, কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।'

০ এগার ০

মানুষকে বলা হয় প্রজ্ঞা বা বোধ বা মনীষা বা বিচার শক্তি সম্পন্ন জানোয়ার। সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থায় এই জানোয়ারটি সংযত থাকে। সমাজ বিপর্যস্ত হলে এই জানোয়ারটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তখন তার ক্রিয়াকাণ্ড দেখে সত্যিকারের জানোয়ারও ভীত হয়।

০ বার ০

বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে কথা হচ্ছিল।

বান্ধবীর প্রশ্ন : তুমি বড়লোক হতে চাওনা কেন?

আমার উত্তর : অফুরন্ত টাকার আড়ালে সহজ স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক জীবনটা যেন কোথায় হারিয়ে যায়—তাই।

প্রশ্ন : গরীবও তো হতে চাও না ?

উত্তর : না। একেবারে অর্থহীনতায় নিঃস্বতায় নগ্নতায় উপায়হীনতায় উদ্বেল জীবন প্রবাহটা কেমন যেন শুকিয়ে যায়—তাই।

প্রশ্ন : বুঝলাম। মধ্যবিত্ত হওয়াটাই তোমার জীবন সাধনা। কিন্তু প্রশ্ন—কী মাধুর্য খুঁজে পেয়েছ এই মধ্যবিত্ত জীবন সাধনায় ?

উত্তর : কৈশোর নয়, বার্ধক্যও নয়—যৌবনের মাধুর্য। শক্তিহীনতা নয়, শক্তিমত্ততাও নয়—শক্তির সমতা, শক্তির সংযম। স্থূল দেহী নয়, সূক্ষ্ম দেহীও নয়—মাঝামাঝি গড়নের সুস্বাস্থ্য। নিরম্বু উপবাস নয়, অতিভোজনের বদহজমও নয়—স্বাস্থ্যোপযোগী পরিমিত আহার। গাঢ় অন্ধকার নয়, তীব্র আলোকও নয়—শুদ্ধ কোমল ভোরের আলোর ভৈরবী। সবকিছু ত্যাগ করা নয়, সবকিছু ভোগ করাও নয়—ত্যাগের ভোগের মিশ্ররাগের ঝিঞ্ঝোটি-টোড়ী। শুধু অহিংসা নয়, কিছু হিংসাও—অহিংসা হিংসার যুগল মূর্তি কৃষ্ণ-কালী। শুধু ভাল নয়, কিছু মন্দও—ভাল মন্দের মিশ্রণে পরিপূর্ণ জীবন মাধুরী।

আমি চুপ করলাম। বান্ধবীও প্রশ্নহীনা। বিয়ারে শেষ চুমুক দিয়ে দু'জনেই বেরিয়ে পড়লাম পার্ক ষ্ট্রীটের 'বার' থেকে। রাস্তার দু'পাশে রঙ বেরঙের নানান মডেলের বহু মূল্যের মোটর গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কিছুদূর পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল অল্পমূল্যের প্রায় একই মডেলের শ্রীহীন দু'চারটে রিক্সা। হাত নেড়ে ডাকলাম একটা ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই বান্ধবীর প্রশ্ন : কবে গাড়ি কিনছ ? আমার সংক্ষিপ্ত উত্তর : এইতো বেশ। প্রাইভেট মোটরও নয়, রিক্সাও নয়—ট্যাক্সি।

বান্ধবীর সহাস্য টিপ্পনি : মাঝামাঝি। আমি এর নাম দিলাম মধ্যমিকা—মানে মধ্যবিত্তের গাড়ি।

আমি সশব্দে হো-হো করে হেসে উঠলাম। ঢলে পড়লাম বান্ধবীর কাঁধে। টিপ্পনির জবাব দিলাম : যেমন তুমি—উর্বশীও নও, আবার শাঁকচুন্নীও নও। মাঝামাঝি। মধ্যবিত্ত ঘরের মাঝারি গড়নের এক তন্বী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা শিখরী দশনা মিস্ অনুসূয়া।

বান্ধবীও সহাস্যে ঢলে পড়ল আমার কাঁধে।

ট্যাক্সি চলেছে চৌরঙ্গীর মসৃণ পথ দিয়ে তীব্র বেগে।

০ তের ০

নারীত্ব আর সতীত্ব—দুটো আলাদা জিনিস। অনেক নারীত্বের সতীত্ব নেই আর অনেক সতীত্বের নারীত্ব নেই। এমন নারী খুবই কম যার নারীত্ব আর সতীত্ব দুই-ই বর্তমান। পুরুষকে সর্বাধিক আকর্ষণ করে সেই নারী একাধারে যে নারীত্বে আর সতীত্বে মহিমান্বিতা।

০ চৌদ্দ ০

চোখের ভাষায় যেন বলতে চেয়েছিল সে : না। যেও না। আজ আর চেম্বারে যেও না। এমনি করে অনেকক্ষণ আমার পাশটিতে বসে থাক। নির্বাক হয়ে। শুধু আমাকে দেখো। শুধু চোখের ভাষাতে কথা বল। অনেকক্ষণ। থাক কাজ। কর্তব্য। দায়িত্ব। নিয়ম। শৃঙ্খলা। আজ শুধু বসে থাকা। আজ শুধু চেয়ে দেখা। আজ শুধু হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো

কথা বলে ফেলা। আজ এই মুহূর্তে ভাল লাগছে বসে থাকতে। চেয়ে দেখতে। হঠাৎ কথা বলে ফেলতে। এমন ভাল লাগা হয়তো জীবনে আর কোনদিন আসবে না। এমনি বসে থাকার সময় হয়তো আর কোনদিন পাওয়া যাবে না। এমনি করে চেয়ে দেখতে—কথা বলতে—হয়তো আর হয়ে উঠবে না। কোথায় হারিয়ে যাবে তুমি। কোথায় হারিয়ে যাব আমি। কোথায় হারিয়ে যবে এই ভাললাগার মনটা। লগ্নটা। কাজের দায়িত্ব বাড়বে। অবকাশের সঞ্চয়টুকু নিঃশেষ হয়ে যাবে কর্তব্য পালনের নিরস নিয়ম শৃংখলায়। কত রূপান্তর ঘটবে এই শারীর গঠনের। আশা নিরাশার ভাল মন্দের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এসে যখন মুখোমুখি হব তু'জনে—তখন হয়তো ভাল লাগবে না এমনি পাশাপাশি বসে থাকতে, এমনি করে চেয়ে দেখতে, কথা বলতে, আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশে সরে আসতে।

তাই যেও না। আজ আর চেম্বারে যেও না। অনেকক্ষণ বসে থাক। অনেকক্ষণ চেয়ে দেখো। অনেকক্ষণ কথা বল। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ। যতক্ষণ পারো। শুধু চলে যেও না।

০ পনেরো ০

সর্বকালের আর সর্বদেশের জনগনের একটা বৃহৎ অংশ নির্বোধ, নীতিহীন, সুবিধাবাদী, স্বার্থবাদী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হুজুকপ্রিয় আর প্রতিক্রিয়াশীল। বুদ্ধিমান মানুষ চিরদিন এদের ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে কাজে লাগিয়ে এসেছেন। সেদিনের জনগণ আর আজকের জনগণের বহিরঙ্গের তফাৎ প্রচুর কিন্তু অন্তরঙ্গে এরা এক, অভিন্ন।

আজকের জনগণের প্রেতাত্মাই সেদিন রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রচলনের বিরুদ্ধে মারমুখো হযে উঠেছিল। বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীয় ভাবধারাকে পাগলের প্রলাপোক্তি বলেছিল। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে উদ্ভট কবি কল্পনা আখ্যা দিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের ভ্রষ্টা নারীর সতীত্বের মহিমা কীর্তনকে চরিত্রহীন লেখা—এই বলে উপহাস করেছিল। গিরিশের আধুনিক নাট্য প্রচেষ্টাকে অমার্জিত ভাষায় কটূক্তি করেছিল। সাগরপার থেকে কৃতবিদ্য হয়ে স্বদেশে ফিরে এলে ভারত সন্তান-গণকে একঘরে করেছিল। নেতাজীর স্বপ্ন সাধনাকে, ভারতের সহিংস বিপ্লব প্রচেষ্টাকে অহিংসার মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করা হয়েছিল, অপাংক্তেয় করা হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথকে জুতোর মালা উপহার দিয়েছিল এই জনসাধারণই। এই জনসাধারণই অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে অকুলীন, অশালীন, অশ্লীল এই আখ্যা দিয়েছিল।

তবু প্রগতি ব্যাহত হয়নি, সমাজ এতটুকু অনগ্রসর হয়নি, সৃষ্টিও থেমে যায় নি। অশান্ত জনগণ শান্ত হয়েছে, অসংযত জনগণ সংযত হয়েছে, অস্থির জনগণ স্থির হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংস্কারকে মেনে নিয়েছে, প্রগতিকে মেনে নিয়েছে। ইতিহাস এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে। যেমন আগে চলেছিল। তেমনি আজও। তেমনি পরেও।

O. ষোলো O

শ্রীরামকৃষ্ণ একথা কোনদিন নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্রকে বলেন নি : গিরিশ তুমি মদ খেয়ো না। নটীদের সঙ্গে অত মাখামাখি

করো না। পৌরানিক, সামাজিক আর হাস্তরসাত্মক নাটক লিখো না। সমালোচনামূলক সাহিত্যেও নিজের প্রতিভাকে নিয়োজিত করো না। ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখো না। শুধু আধ্যাত্মিক নাটক লিখো। শুধু যেসব নাটকে মানুষের ঈশ্বরানুরক্তি বাড়ে সেইসব নাটক লিখো। ভুলেও পাত্র-পাত্রীদের মুখে চরিত্রানুযায়ী সংলাপ বসিও না। দুষ্ট চরিত্রের পাত্র-পাত্রাদের মুখে অশ্লীল কথা না বসিয়ে শুধু সৎ সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করো। শুধু সাধু সন্ত মহাপুরুষ মহামানব সম্পৃক্ত চরিত্রবানদেরই হিরো করো। শুধু ভারতীয় ধর্মের সার কথাগুলি নাটকাকারে পরিবেশন করো। মানুষ যাতে শিক্ষা পায় শুধু সেইসব নাটকই লিখো। ভুলো না তুমি নাট্যকার—তুমি সমাজের মাষ্টার মশাই, গুরুমশাই, তুমি ধর্মাবতার। শ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রচার করাই হবে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। আর আমার ভক্ত শিষ্য শিষ্যাদের সেইসব কীর্তি কাহিনী শুনে আহ্লাদের আর সীমা থাকবে না। তোমার মধ্যে মহাপুরুষ মহাপুরুষ ভাব দেখেছি বলেই তো বারবার তোমার কাছে ছুটে আসি। সেই জন্যই তো বার বার তোমার জন্যে মনটা আমাব কাঁদে—না এসে থাকতে পারি না। আমি আশীর্বাদ করি তুমি বাংলা দেশের একজন মহামানব নাট্যকার হয়ে ওঠ। দিকে দিকে এই বলে তোমার নাম প্রচারিত হোক : পরম শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত বাংলার মহামতী নাট্যকার শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে যে কথা বলেছিলেন তার সারমর্ম : গিরিশ চিরদিন তুমি গিরিশই থেকো। অন্য কারোর মতো হবার তোমার দরকার নেই।

০ সতেরো ০

ব্রাহ্মণ শূদ্রের চেয়ে অধিক বিদ্বান, বুদ্ধিমান, মেধাবী, শক্তিশালী, মার্জিত, ভদ্র, কূটবুদ্ধি সম্পন্ন প্রভৃতি কৃত্রিম অবৈজ্ঞানিক ভুল ধারণা যত তাড়াতাড়ি পারো মন থেকে দূর করে দাও। দেখবে পৈতের তফাৎ ছাড়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে শূদ্রের আর কোন তফাৎ নেই। দেখবে মনুষ্যত্বের গুণাবলীতে দু'জনেই সমান। দেখবে বজ্জাতিতে দু'জনেরই প্রতিভা এক। দেখবে বুদ্ধিতে দু'জনেই সমান। দেখবে বুদ্ধিহীনতায় দু'জনেই গোবর গণেশ।

তেমনি আব একটা ভুল ধারণা মন থেকে যত তাড়াতাড়ি পারো দূর করে দাও। সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া আর প্রোলেটেরিয়টের অর্থাৎ সর্বগ্রাসী আর সর্বহারাব কৃত্রিম অবৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ। দেখবে ধন অসাম্যের তফাৎ ছাড়া (যেটা সব যুগেই ছিল, এ যুগেও আছে আর আগামী যুগেও থাকবে) বুর্জোয়ার সঙ্গে প্রোলেটেরিয়টের আর অন্য কোন তফাৎ নেই। দেখবে মনুষ্যত্বের গুণাবলীতে দু'জনেই সমান। দেখবে নীচতায়, কামে, ক্রোধে, লোভে, মোহে, মদে, মাৎসর্যে, হৃদয়হীতনায়, অপরের ক্ষতি করার কু-মতলবে, চরিত্রহীনতায়, হিংসায়, মাৎস্যন্যায় কলা কৌশলে, পাশব শক্তির তাড়নায়, অলসতায়, অকর্মণ্যতায় দু'জনেরই প্রতিভা এক। দেখবে বুদ্ধিতে দু'জনেই সমান। দেখবে বুদ্ধিহীনতায় দু'জনেই গোবর গণেশ।

০ আঠারো ০

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : নারী হচ্ছে মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান।

সিদ্ধান্তটি আংশিক সত্য। সম্পূর্ণ সত্য নয়।

আমার মতে : নারী হচ্ছে সৃষ্টির আধার, হ্লাদিনী শক্তি, আনন্দ, অনুপ্রেরণা, আদি বা শৃঙ্গার রস স্বরূপিনী।

O উনিশ O

নরনারী যেন বিপরীত ধর্মী দু'গাছা ইলেকট্রিকের তার। একজন পজেটিভ্—একজন নেগেটিভ্। একজন "হ্যাঁ"-একজন "না"। একজন কর্তা—একজন আধার। একজন কাছে এগিয়ে আসা—একজন দূরে পালিয়ে যাওয়া। একজন ফুৎকার—একজন বাঁশী।

এই দুইটি ভিন্নধর্মের, ভিন্ন মেজাজের, ভিন্ন অনুভূতির, ভিন্ন সুখ দুঃখ বোধের, ভিন্ন ভাবনা চিন্তার একত্রীকরণ না হলে সৃষ্টি সম্ভব হয় না। জীবন সম্পূর্ণ হয় না। জগৎ মধুময় হয় না। বাঁশী বাজে না। আলো জ্বলে না।

O কুড়ি O

কবি নজরুলকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম :

আপনি এতবড় একজন বিদ্রোহী কবি—আর সেই বিদ্রোহী কলম দিয়ে কি করে লিখলেন—"কে বিদেশী, মন উদাসী—বাঁশের বাঁশী বাজালে বনে" অথবা "বাগিচায় বুলবুলি তুই" অথবা "মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর" অথবা "একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী। ফুলে ও ফসলে কাদা-মাটী-জলে ঝলমল করে লাবণী॥" অথবা "আজি নন্দ-দুলালের সাথে, ঐ খেলে ব্রজনারী হোরি। কুঙ্কুম আবীর হাতে—দেখো খেলে শ্যামল

খেলে গোরী॥” অথবা “রঙিলা আপনি রাধা, তারে হোরির রঙ দিও না। ফাগুনের রাণী যে রাই, তারে রঙে রাঙিও না॥ রাঙা আবীর রাঙা ঠোঁটে, গালে ফাগের লালী ফোটে, রঙ সায়রে নেয়ে উঠে, অঙ্গে ঝরে রঙের সোনা॥” অথবা “আধো আধো বোল, লাজে বাধো বাধো বোল, ব'লো কানে কানে। যে কথাটী আধো রাতে, মনে লাগায় দোল, ব'লো কানে কানে॥ যে কথার কলি সখি আজো ফুটিল না—শরমে মরম-পাতে দুলে আনমনা, যে কথাটী ঢেকে রাখে বুকের আঁচল—ব'লো কানে কানে॥ যে কথাটী লুকানো থাকে লাজ-নত চোখে, না বলিতে যে কথাটী জানাজানি লোকে, যে কথাটী ধ'রে রাখে অধরের কোলে—ব'লো কানে কানে॥ যে কথা কহিতে চাহ বেশ-ভূষার ছলে। যে কথা প্রকাশ তব দেহে পলে পলে, যে কথাটী বলিতে সই গালে পড়ে টোল্—ব'লো কানে কানে॥” অথবা “দোপাটি লো, লো করবী, নাই সুরভী, রূপ আছে। রূপের পাগল রূপ-পিয়াসী সেই ভালো আমার কাছে॥” অথবা “আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়ন-তারা, হৃদয়ে মোর রাধা প্যারী। আমার প্রেম প্রীতি ভালবাসা, শ্যাম-সোহাগী গোপী নারী॥” অথবা “দুধে আলতায় রঙ যেন তার সোনার অঙ্গ ছেয়ে—সে ভিন্ গাঁয়েরই মেয়ে। চাঁদের কথা যায় ভুলে লোক তাহার পানে চেয়ে, সে ভিন্ গাঁয়েরই মেয়ে॥ ও পারের ওই চরে যখন চুল খুলে সে দাঁড়ায়, কালো মেঘের ভিড় লেগে যায় আকাশের ওই পাড়ায়, পা ছুঁতে তার নদীর জলে জোয়ার আসে ধেয়ে। সে ভিন্ গাঁয়েরই মেয়ে॥” অথবা “ব'লো না ব'লো না ওলো সই, আর সে কথা। তরু কি লতার কাছে এসে কভু প্রেম যাচে, তরু বিনা নাহি বাঁচে অসহায় লতা। ভুলিতে যার নাই তুলনা, সখি তার কথা তুলোনা, প্রাণহীন পাষাণে গড়া, সে যে দেবতা।” অথবা “পিউ পিউ পিউ বোলে পাপিয়া। বুকে তারি পিয়ারে চাপিয়া॥” অথবা “মরম কথা গেল সই মরমে মরে। সরম বারণ যেন করিল চরণ ধ'রে॥”

অথবা "এলো শ্যামল কিশোর তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা। সুনীল সাড়ী পর ব্রজনারী, পর নব নীপমালা অতুলনা॥ ডাগর চোখে কাজল দিও—আকাশ-রঙ্ প'রো উত্তরীয়॥ নব ঘনশ্যামের বসিয়া বামে—দুলে দুলে বলিব, "বঁধু ভুলোনা॥" অথবা "তোমার বুকের ফুলদানিতে" অথবা "ভারত-লক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ ভারতে। ব্যথায় মোদের চরণ ফেলে—অরুণ আশার সোনার রথে॥" অথবা "আমার দেশের মাটী, ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি॥ এই দেশেরই মাটী জলে, এই দেশেরই ফুলে ফলে, তৃষ্ণা মিটাই, মিটাই ক্ষুধা, পিয়ে এরি দুধের বাটি॥" অথবা "গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই, বহিয়া চলেছে আগের মত—কইরে আগের মানুষ কই? মৌনী স্তব্ধ সে হিমালয়, তেমনি অটল মহিমাময়, নাহি তার সাথে সেই ধ্যানী ঋষি, আমরাও আর সে জাতি নই॥" অথবা "শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির নির্ম্মল, শান্ত অচঞ্চল ধ্রুব-জ্যোতি! অশান্ত এ চিত করহে সমাহিত, সদা আনন্দিত রাখ মতি॥ দুঃখ শোক সহি অসীম সাহসে, অটল রহি যেন সম্মানে যশে, তোমার ধ্যানের আনন্দ রসে, নিমগ্ন রহি হে বিশ্ব-পতি॥"

নজরুল এর জবাব না দিয়ে শুধু একটু হেসেছিলেন। হয়তো সেই হাসির অন্তরালে যে অনুচ্চারিত কথাটা চিরদিনের আখরে লেখা হয়ে থাকল—তার মর্মার্থ :

জীবনটা শুধু বিদ্রোহ, বিরোধ, বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, অভিযোগ, আন্দোলন, ধর্মঘট, ঘেরাও, আক্রমণ, জোর জুলুম, নিন্দা, অসম্মান, ঘৃণা আর পাওয়ার সর্বস্ব নয়। জীবনটা শুধু বজ্রের মতো কঠোর, ইস্পাতের মতো কঠিন, পর্বতের মতো অনড় আর অচল নয়। জীবনটা কুসুমের মতো মৃদুও, ভিজে মাটির মত নরমও আর নদীর স্রোতের মতো প্রবহমানও। তোমাদের কবিকে যদি সত্যিই ভালবেসে থাক, তাহলে একমাত্র তার বিদ্রোহের কবিতাই আবৃত্তি করো না—দুটো প্রেমের গানও গেয়ো। তোমাদের নজরুলকে শুধু বিদ্রোহী কবি বলো না—বলো জীবনের কবি, ভালবাসার

কবি, নির্যাতিত মানবাত্মার কবি, সৌন্দর্যের কবি ; শুধু 'অগ্নি-বীনা'র কবিই নয়—'সঞ্চিতা'র কবিও।

O একুশ O

প্রশ্ন : 'আপনি কোন দলের সমর্থক ?'

উত্তর : 'আমি 'মনুষ্যত্বের জয়গান গাই' দলের সমর্থক।

প্রশ্ন : 'না—না, আপনি কোন রাজনৈনিক দলের সমর্থক ?'

উত্তর : মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে যে রাজনৈতিক দল গড়া হয়েছে —আমি সে দলের সমর্থক নই।'

O বাইশ O

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে দারিদ্র প্রধান অন্তরায়।

"হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছ মহান,
তুমি মোরে দানিয়াছ খৃষ্টের সন্মান।"

এটা নজরুলের নিছক কাব্যোচ্ছ্বাস। কাব্যিক সত্য। জীবন-সত্য নয়। দারিদ্র কখনও মানুষকে মহান করে না—দারিদ্র কখনও মানুষকে খৃষ্টের সন্মান প্রদান করে না।

দারিদ্র মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে ভোঁতা করে দেয়। সৎকে করে অসৎ, শৃঙ্খলায় আনে বিশৃঙ্খলা, প্রগতিকে রূপান্তরিত করে পশ্চাদগতিতে, দেবত্বকে পশুত্বে। এটা সাধারণ নিয়ম। ব্যাতিক্রম দু-চারটে আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়ে মনুষ্যত্বের মূল্যায়ণ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

০ তেইশ ০

শুধু সমালোচনা নয়। শুধু নিন্দে নয়। কিছু কাজ কর। কাজ করতে করতেই দেখবে তুমি নিজেই সমালোচনার পাত্র অথবা পাত্রী হয়ে উঠেছ। সব কাজেই ভুল ভ্রান্তি আছে। দেখবে সব কাজেরই সমালোচনা হয়। নিন্দে হয়। তাই ভাল কাজটাও মন্দ লোকের কাছে খারাপ কাজ হয়ে ওঠে। আবার মন্দ কাজটাও ভাল লোকের কাছে ভাল কাজ হয়ে ওঠে।

প্রথম উদাহরণ : রামবাবু লোকটা সরল। মানুষকে বিশ্বাস করেন। নিজে মিথ্যে কথা বলেন না। কোন অসৎ কাজ করতে বললে সাত বার রাম নাম জপ করেন। শ্যামবাবু কিন্তু ঠিক তার উল্টো। সব সময় ফাঁক খুঁজছেন কি করে মানুষকে ঠকাবেন। ঠকালেন। স্কুলের লাইব্রেরী সম্প্রসারণের নাম করে এক হাজার এক টাকা দান হিসাবে গ্রহণ করলেন রামবাবুর কাছ থেকে। দীর্ঘ এক বছর পরে দেখা গেল দেয় দানের একটা পয়সা দিয়েও বই কেনা হয়নি। রামবাবু স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানালেন। কিন্তু শ্যামবাবু নিজেই সেক্রেটারী। হিসেবের কারচুপি তাঁর নখদর্পণে। উপায়ন্তর না দেখে রামবাবু আরো পাঁচশো টাকার আক্কেল সেলামী দিলেন। নিজের হাতে বই কিনে স্কুলকে দান করলেন। মনে শান্তি পেলেন। আর এতে প্রমাণ হল ভাল কাজটা মন্দ লোকের কাছে খারাপ কাজ হয়ে উঠল। আবার সেই খারাপ কাজটা ভাল লোকের কাছে ভাল হয়ে উঠল। শ্যামবাবুকে বিশ্বাস করবার জন্যে অনেক সমালোচনা নিন্দে হল। এর উত্তরে রামবাবু শুধু বললেন : কাজে নামো—দেখবে জগতে শ্যামবাবু শুধু ঐ একজনই নেই।

দ্বিতীয় উদাহরণ : পাঁচকড়িকে মহল্লায় সবাই চেনে। কেউ

বলে চরিত্রহীন, গুণ্ডা, খুনী। এদিকে সাতকড়িবাবুর খুব নামডাক চরিত্রবান, আদর্শবাদী, সমাজসেবী বলে। কিন্তু ভোটের সময় সাতকড়িবাবু খুঁজলেন পাঁচকড়িকে। জান কবুল করে খাটল পাঁচকড়ি। সাতকড়িবাবুর জয় হল। এবং প্রথম প্রকাশ্য সভায় সমাজবিরোধী, চরিত্রহীন, গুণ্ডা, বদমায়েস খুনী ডাকাতদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করলেন। পাঁচকড়ি আড়ালে শুধু মুচকি হাসল। আর এতে প্রমাণ হল—খারাপ কাজটা ভাল লোকের কাছে ভাল কাজ হয়ে গেল। আবার সেই ভাল কাজটা মন্দ লোকের কাছে খারাপ কাজ হয়ে গেল। সাতকড়িবাবুর অনেক সমালোচনা নিন্দে হল। এর উত্তরে সাতকড়িবাবু শুধু বললেন : কাজে নামো—দেখবে ভাল কাজ উদ্ধার করতে গেলে কত খারাপ লোকের দরকার হয়। জগতে পাঁচকড়িরাও অপরিহার্য।

০ চব্বিশ ০

মাঝে মাঝে মনে একটা প্রশ্ন জাগে—কোন সদুত্তর খুঁজে পাইনা।

উদগ্র কামনা বাসনা কি নরনারী ভেদে ভিন্ন?

ধনতান্ত্রিক স্বাধীন দেশে উপার্জনশীল পুরুষ গণিকালয় পক্ষান্তরে বহুভোগ্যার কাছে গেলে যদি নিন্দে না হয়—তবে উপার্জনশীলা মহিলারা গণকালয় অভাবে বহুভোগ্যের কাছে গেলে সমাজে নিন্দে কেন হবে?

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শত গোপীনীদের সঙ্গে লীলাখেলা যদি ধর্মীয় ব্যাপার হয়—তবে আধুনিকা শ্রীমতী রাধাসুন্দরীর শত বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে বলড্যান্স অভাবে সামাজিক মাখামাখি বেলেল্লাপনা কেন হবে?

নরনারীর উদগ্র কামনা বাসনা কি লোকাচার দেশকাল পাত্রপাত্রী তত্ত্ব মেনে চলে? এক বিবাহের অনুশাসন কি জীবন সঙ্গত? যদি হয় তবে গণিকালয়ের অস্তিত্ব কেন স্বীকার করি? পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলাকে কেন ধর্মীয় ব্যাপার বলি?

০ পঁচিশ ০

তখন আমি বাংলা মাসিক পত্রিকা "অপাঠ্যে"র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নিয়মিত লিখি।

অফিসে যেতেই সম্পাদক শ্রী রবীন্দ্র নাগ আমার হাতে একটি চিঠি দিলেন। জনৈকা পাঠিকা একটি প্রশ্ন করেছেন: 'প্রেমের প্রকৃত সংজ্ঞা কি? বিস্তারিত উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকলাম।'

সম্পাদককে অনুরোধ করলাম এই প্রশ্নের উত্তর "প্রশ্নবাণ" বিভাগে দেবার জন্যে।

শ্রী রবীন্দ্র নাগ বললেন: তা হয় না। এ চিঠি তোমাকেই লেখা। তবে যদি বলো এর উত্তরটা "প্রশ্নবাণে" তোমার নাম দিয়ে প্রকাশ করতে পারি।

তথাস্তু। এই বলে কিস্তির লেখা জমা দিয়ে—দক্ষিণা নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলাম। এবং লিখতে শুরু করলাম:

প্রেমের প্রকৃত সংজ্ঞা আজো আবিষ্কৃত হয়নি। কোনদিন হবে বলেও মনে হয়না। এই অতি সূক্ষ্ম হৃদয়ভাবটি নিয়ে নানান মুনির নানান মত। মুনিরা শুধু কতকগুলি আভিধানিক ভাবোদ্দীপক শব্দই সৃষ্টি করেছেন। যেমন প্রেম হচ্ছে—ভালবাসা অথবা প্রণয় অথবা অনুরাগ অথবা স্নেহ অথবা প্রীতি। আর এই প্রেম যাঁদের ওপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হয় তাঁরা হচ্ছেন স্ত্রী, পরস্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, স্বজন, বান্ধব, বান্ধবী, সংসার, সমাজ, দেশ,

মহাদেশ, সাকার নিরাকার ঈশ্বর, পুরুষোত্তম মহাপুরুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন কোন দার্শনিক মুনি আবার একথাও বলেছেন—প্রেমই সত্য অথবা সত্যই প্রেম। প্রেমই ভগবান অথবা ভগবানই প্রেম। প্রেমই মনুষ্যত্ব অথবা মনুষ্যত্বই প্রেম। প্রেমই জ্ঞান অথবা জ্ঞানই প্রেম। প্রেমই আনন্দ অথবা আনন্দই প্রেম।

তেমনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও প্রেমকে দেখা হয়েছে—বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন—প্রেম হচ্ছে :

(১) কাম। হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র অনুসারে কাম অথবা যৌনাকাঙ্খা অথবা যৌবনকে উপভোগ করার আনন্দকে প্রেম বলা হয়েছে। ভারতীয় চতুবর্গ ফলপ্রাপ্তির বিন্যাস অনুযায়ী কামের স্থান তৃতীয়। কিন্তু ষড়রিপুর বিন্যাস অনুযায়ী কামের স্থান প্রথম। সাবালক বা সাবালিকার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে প্রাথমিক রিপুর এই দুর্দমনীয় তাড়না ও আনন্দরসঘন উন্মাদনারই কাব্যিক প্রকাশ প্রেম। তাই কামই প্রেম।

(২) যৌন উদ্দীপক সুদেহ। বস্তুবাদীরা বলেন : নরনারীর যৌন উদ্দীপক সুঠাম সুদেহের প্রতি দুর্নিবার আসঙ্গ লিপ্সাই প্রেম। কতকটা যেন সেই বৈষ্ণব কবিতার মতো—"প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" তাই যৌন উদ্দীপক সুদেহই প্রেম।

(৩) সদগুণ। গুণবান অথবা গুণবতীর প্রতি সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হয়। আর অসাধারণ মানুষ হয় গুণবান অথবা গুণবতী। সদগুণের প্রতি মানুষের এই যে স্বাভাবিক আকর্ষণ অথবা আকুতি অথবা টান—এটাকেই বলা হয় প্রেম। যেমন—যে পরীক্ষায় প্রথম হলো—সে অসাধারণ। আর যারা সেই অসাধরণের প্রতি আকৃষ্ট হল, তারা সাধারণ। সংসার, সমাজ, দেশ, মহাদেশের অসাধারণ মানুষদের প্রতি জনসাধারণের মনে এইভাবেই বৃহত্তর প্রেম সঞ্চারিত হয়। ইংরাজীতে এটাকে বলা হয়েছে—"হিরো ওয়ারশিপ্" পক্ষান্তরে "হিরোয়িন ওয়ারশিপ্"। বাংলা তর্জমা—

"নায়ক অথবা নায়িকা বন্দনা।" তাই প্রেমিক ও প্রেমিকার সদগুণাবলীই প্রেম।

(৪) জৈব প্রয়োজন। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখবার জন্যে মানুষকে কতকগুলি জৈব প্রয়োজনের চাহিদা প্রতিদিন মেটাতে হয়। নইলে পরিপূর্ণরূপে প্রাণধারণ করা অসম্ভব। যেমন—ক্ষুধাতৃষ্ণার প্রয়োজনে পানাহার করি। উত্তেজিত স্নায়ুগুলির বিশ্রামের প্রয়োজনে নিদ্রা যাই। শরীর যন্ত্রগুলিকে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম চালাবার প্রয়োজনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে প্রতিদিন পরিচালনা করি। তেমনি মানসিক ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটাবার প্রয়োজনে প্রতিদিন আমরা ভালবাসার অথবা প্রেমের পাত্র অথবা পাত্রীকে খুঁজে ফিরি। প্রেমে পড়ি। তাই জৈব প্রয়োজনই প্রেম।

(৫) ইনস্টিংকট্ বা স্বাভাবিক প্রবণতা। ছেলেদের মেয়েদের ভাল লাগে আর মেয়েদের ছেলেদের ভাল লাগে। এইটাই স্বাভাবিক। যাদের ভাল লাগে না—বুঝতে হবে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে তারা অসুস্থ। অচিরেই তাদের সুচিকিৎসার প্রয়োজন। এবং এই ভাল লাগা থেকে ভালবাসা। আর এই ভালবাসা থেকে প্রেম। মিলন। সম্ভোগ। পরিতৃপ্তি। এবং এইটাই নরনারীর স্বাভাবিক প্রবণতা বা ইনস্টিংকট্। এই স্বাভাবিক প্রবণতার ভজনাই প্রেম।

(৬) আনন্দ সম্ভোগ। পৃথিবীর সকল প্রেমিক প্রেমিকাই জানেন জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ এই প্রেমানন্দ। প্রেমের আনন্দে সমস্ত শরীর মন যেন আনন্দে গান গেয়ে ওঠে। সমস্ত আশা আকাঙ্খা যেন ময়ূরের মতো পেখম তুলে নাচতে শুরু করে। সমস্ত ভাললাগা একটি ছিদ্রে কেন্দ্রীভূত হয়ে যেন বাঁশী হয়ে বেজে ওঠে। এই প্রেমানন্দের সম্ভোগ ভুলিয়ে দেয় রোগ শোক দুঃখ কষ্ট অভাব অনটন হতাশা আর জীবনের অসাফল্য। ভুলিয়ে দেয় জীবন যন্ত্রণার গ্লানি। তখন মনে হয়, এ পৃথিবীতে শুধু প্রেম আছে,

গীত আছে, বাদ্য আছে, নৃত্য আছে। মনে হয় জীবন শুধু কবিতাময়। মনে হয় পৃথিবী শুধু মধুময়। তাই আনন্দ সম্ভোগই প্রেম।

(৭) ভাললাগা। এটিকে প্রেমের প্রথম স্তর বলা যেতে পারে। তেমনি ভালবাসাকে দ্বিতীয় স্তর। প্রেমকে তৃতীয় বা শেষ স্তর বলা যেতে পারে। কোন জিনিসকে ভাল না লাগলে—ভালবাসা যায় না। ভালবাসা না থাকলে—প্রেমকে অনুভব করা যায় না—প্রেমের স্থায়িত্ব চিরকালীন হয় না। আবার এই ভাললাগার সঙ্গে নিকষিত হেমের মতো কামগন্ধহীন প্রেমের একটা সাদৃশ্য আছে। অমুক উপন্যাসটি পড়তে আমার ভাল লেগেছে—আমি ঐ উপন্যাসটির বা ঔপন্যাসিকের প্রেমে পড়েছি। ভাল লাগে অমুকের লেখার স্টাইলটা—আমি ঐ লেখকের প্রেমে পড়েছি। ভাল লাগে অমুকের অমুক মতবাদটি—আমি সেই মতবাদটির প্রেমে পড়েছি। ভাল লাগে অমুক রেস্তোঁরার মোগলাই খানা—আমি ঐ রেস্তোঁরার প্রেমে পড়েছি। ভাল লাগে অমুক অভিনেত্রীর অভিনয়, অমুক শিল্পীর সংগীত, অমুক খেলোয়াড়ের খেলা, অমুক রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা—আমি ঐ অভিনেত্রীর, শিল্পীর, খেলোয়াড়ের, রাজনৈতিক নেতার প্রেমে পড়েছি। তাই বলা যেতে পারে ভাল লাগাই হচ্ছে প্রেমের বনেদ। ভালবাসা অট্টালিকা। প্রেম চুনকাম রং চং। তাই ভাল লাগাই প্রেম।

(৮) বাহাদুরি। সব প্রেমের মধ্যেই একটা প্রচ্ছন্ন বাহাদুরির ভাব রয়েছে। এটিকে বলা যেতে পারে প্রেমের খাদ। আসল সোনার সঙ্গে খাদটুকু মেশালে তবেই অলংকারের শোভা বাড়ে। আসল প্রেমের সঙ্গে এই বাহাদুরির খাদটুকু মেশালে তবেই প্রেমিক প্রেমিকার শোভা বাড়ে। আরো পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, হিরো হিরোয়িন আখ্যায় ভূষিত/ভূষিতা হয়। আবার এই প্রচ্ছন্ন বাহাদুরির মধ্যে রয়েছে তিনটি পর্ব। প্রথম পর্ব যেন—মূল অর্থাৎ "আমি এলাম" ভাব। দ্বিতীয় পর্ব যেন—বৃক্ষ অর্থাৎ

"আমি দেখলাম" ভাব। তৃতীয় পর্ব যেন—ফল অর্থাৎ "আমি জয় করলাম" ভাব। তাই শ্রেষ্ঠ প্রেমিক প্রেমিকারা বলেছেন : কিছুটা বাহাদুরি না থাকলে প্রেম জমে না। মিনমিনে শান্ত সুবোধ সরল অথবা সাতে নেই পাঁচে নেই অথবা ওসব উটকো ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় কাজ নেই অথবা খাই দাই নিজের মনে কাজ করে যাই—ধরণের শান্তশিষ্ট শিব তুল্য মানুষ যারা তারা কোনদিন আদর্শ প্রেমিক প্রেমিকা হয়ে উঠতে পারে না। তাই একমাত্র বাহাদুররা বা বাহাদুরনীরাই প্রেমিক হিরো অথবা প্রেমিকা হিরোয়িন হয়ে উঠতে পারে। এবং হয়ও। তাই বাহাদুরিই প্রেম।

(৯) খেলা। পৃথিবীতে যত রকমের খেলা আবিস্কৃত হয়েছে—প্রেমের খেলা তার মধ্যে শুধু অন্যতম শ্রেষ্ঠ নয়—মধুরতম, সবচেয়ে রসঘন, সবচেয়ে চিত্তগ্রাহী, সবচেয়ে আনন্দবর্ধক। রস সাহিত্যের প্রধান উপজীব্যই নাকি এই খেলা। এই দিক থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে "রোমিও-জুলিয়েট"কে। কত বিচিত্র রূপ এই খেলার। রস সাহিত্যের মুনি ঋষিরা বলেন : এত বৈচিত্র আর কোন খেলাতেই লক্ষ্য করা যায় না। মান, অভিমান, দুষ্টুমি, শয়তানী, প্রগলভতা, কপটতা, ছেলেমানুষি, পাকামি, আকাঙ্খা, অভিনয়, মিথ্যাচার, পাওয়া সুর হারিয়ে যাওয়া, হারানো সুর ফিরে পাওয়া, ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শত্রুতা, মিত্রতা,—এমনি শত সহস্র বৈচিত্র এ খেলার। দর্শকরা দেখে মনে করে এ খেলা যেন কোনদিন শেষ হবে না। কিন্তু একদিন শেষ হয়। সেদিন জয় পরাজয়ের ফল ঘোষিত হয়। দর্শকরা হাফ ছেড়ে বাঁচেন প্রেমের পূর্ণচ্ছেদে। কিন্তু মনটা অতৃপ্তিতে ভরে থাকে। বুদ্ধি দিয়ে সব সময় বোঝাও যায় না এ খেলা। হৃদয় দিয়ে অনুভব করবারও উপায় নেই। তাই বোঝাবার সুবিধের জন্যে তাঁরা এ খেলাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়েছেন। যেমন—

(ক) দ্বৈত খেলা অর্থাৎ যখন খেলোয়াড় মাত্র দু'জন। একজন প্রেমিক আর একজন প্রেমিকা। একমাত্র এই দু'জনেরই মান অভিমান মিলন বিরহ নিয়ে এই শ্রেণীর খেলার শুরু ও শেষ।

(খ) ত্রিভুজী খেলা বা ত্রিকোণী খেলা অর্থাৎ যখন খেলোয়াড় মাত্র তিনজন। একজন প্রেমিক আর দুজন প্রেমিকা অথবা একজন প্রেমিকা আর দুজন প্রেমিক। কখনও "ক", "খ"—"গ" এর সঙ্গে খেলছে। অথবা "ঘ", "ঙ"—"চ"এর সঙ্গে খেলছে। অথবা "গ", "ক"—"খ"এর সঙ্গে খেলছে। শেষে "ক" ও "খ"এর খেলা জমে উঠল। খেলা শেষ হয়ে গেল। "গ" কোথায় ছিটকে পড়ল তার খবর কেউ আর রাখল না। পক্ষান্তরে "গ" ও "ঙ"এর খেলা সবচেয়ে জমে উঠল। খেলা শেষ হয়ে গেল। "চ" কোথায় ছিটকে পড়ল তার খবর কেউ আর রাখল না।

(গ) চতুর্ভুজী খেলা বা চতুষ্কোনী খেলা অর্থাৎ যখন খেলোয়াড় মাত্র চারজন। এ খেলার পদ্ধতিও প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলার মতো। তফাৎ শুধু এ খেলায় কেউ ছিটকে যায় না। জোড়ায় জোড়ায় মিলন হয়। খেলা শেষ হয়ে যায়।

(ঘ) মক্ষীরাজ বা মক্ষীরাণী খেলা বা মাধ্যাকর্ষণ খেলা অর্থাৎ যখন একপক্ষে খেলোয়াড় মাত্র একজন মক্ষীরাজ বা মক্ষীরাণী এবং অন্যপক্ষে শত সহস্র খেলোয়াড় বা মক্ষীদল। এ খেলা খুব জটিল। খুব পাকা খেলোয়াড় ছাড়া মক্ষীরাজ বা মক্ষীরাণীর খেলা খেলতে পারে না। খেলার শুরুতে বুঝতেও পারা যায় না—কে জিতবে, কে হারবে, কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে, অথবা কোন মক্ষীর গলাতেই জয়মাল্য দুলছে না—জয়মাল্য দুলছে মক্ষীদল বহির্ভূত ধনকুবের ঘনশ্যামদাস ঝুনঝুনওয়ালার গলায় অথবা অচলা লক্ষ্মীযুক্তা কুমারী রাধারাণী খাণ্ডেলওয়ালীর গলায়। পণ্ডিতরা বলেন: এইটিই নাকি প্রেমের আসল খেলা। সভ্য জগতে দিনের পর দিন এ খেলার চাহিদা বেড়েই চলেছে। শিক্ষিত শিক্ষিতাদের

মধ্যে এ খেলার প্রচলন সবচেয়ে বেশী। সমাদরও বেশী।

(১০) মৃত সঞ্জীবনী সুধা। প্রেমকে বলা হয় মৃত সঞ্জীবনী সুধা। এ সুধা পান করলে মনমরা মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বারবার তার কথা শুনতে, নিজের কথা শোনাতে, পাশে এসে বসতে, মান অভিমান করতে, দূরে চলে যেতে, আবার পাশে ফিরে আসতে—ভাল লাগে। ভাল লাগে এক ফোঁটা, দু'ফোঁটা, এক পেগ, দু'পেগ —আকণ্ঠ এ সুধা পান করতে। পান না করলে কোনো কাজে মন বসে না। কোন কথা শুনতে ভাল লাগে না। টাকা কড়ি, ঘরবাড়ী, আসবাব পত্র কিছুই ভাল লাগে না। খেতে, শুতে, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে, কোনো কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে ভাল লাগে না। মনে হয় সবই আছে—তবু যেন কিছুই নেই। মনে হয় সংসার সমাজ রাষ্ট্র সব অর্থহীন। জীবনটা মূল্যহীন। কোনো ওষুধেই এ রোগ সারে না। শত বাক্যব্যয় করলেও বোঝানো যায় না—রোগটা আসলে কী। শত পরীক্ষা করেও দেখা যায় না—রোগটা কোথায়—দেহে না মনে? অদ্ভুত এই জীবন রসায়ন। এক ফোঁটাতেই ভাল না লাগার সব উপলক্ষ দূর হয়। নির্জীব হয় সজীব। মৃতপ্রায় হয় জীবন্ত। পণ্ডিতরা বলেন: পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান এই প্রেমসুধা। যে পান করলো না, সে আহাম্মক, সে হতভাগ্য। মিথ্যা তার মানব জন্ম। মিথ্যা তার শুধু শুধু বেঁচে থাকা। মিথ্যা তার শুধু শুধু মরে যাওয়া। বিখ্যাত প্রেমিক প্রেমিকারা বলেন: এ সুধা পান করলেও জ্বালা, আবার পান না করলেও আরো জ্বালা।

আমার অভিমত: একটু আধটু হেলথ ড্রিংক হিসেবে এই মৃত সঞ্জীবনী সুধা পান করাই ভাল। এতে মানসিক আর শারীরিক স্বাস্থ্য সারাজীবন আনন্দ মুখর হয়ে থাকে।

০ ছাব্বিশ ০

কোনও বিশেষ একটি মানুষকে পৃথিবীর সকল মানুষের ভালো লাগে—এমন মানুষ এখনও জন্মগ্রহণ করেন নি। এমন কোনো বিশেষ একটি রাজনৈতিক মতবাদেরও পয়দা হয়নি যা পৃথিবীর সকল মানুষ নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন। কোনো বিশেষ একটি ধর্মেরও এখন বিকাশ হয়নি যা পৃথিবীর সকল মানুষ স্বীকার করে নিয়েছেন—সেই একটি মাত্র ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের গ্রহণযোগ্য বলে। তেমনি বিশেষ কোন একটি রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা দীক্ষা খাদ্য পরিধেয় ভাষার সৃষ্টি হয়নি—যা পৃথিবীর সকলের পক্ষেই অনুকরণ যোগ্য। এ নিয়ে অভিমান করা ঠিক নয়। পৃথিবীর অখণ্ডতা বা একতা বিপন্ন এ নিয়ে হাহুতাশ করাও বৃথা—এ নিয়ে প্রতাপ প্রতিপত্তি দেখিয়েও কোন লাভ নেই। আর এটাও ভাবা ঠিক নয়—অধিক সংখ্যক মানুষ যেটাকে মেনে নিয়েছেন, অল্প সংখ্যক মানুষও সেটাকে মেনে নিতে বাধ্য। অধিক সংখ্যকের মেনে নেওয়াটা সত্যি। আর অল্প সংখ্যকের না মানাটা মিথ্যে। আর এই অল্প সংখ্যককে অধিক সংখ্যকের দলে টেনে নিয়ে আসতে হবে অমানুষিক অত্যাচার অবিচার নিগ্রহ ভয় হিংসা দ্বেষ আর ঘৃণার বর্বোরচিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এটা ঠিক নয়।

এটা অন্যায়। এটা মানবতা বিরোধী কাজ। অধিক সংখ্যকের যদি সত্যই কিছু ভাল থাকে—অল্পসংখ্যক আজ না হয়, আগামী কাল স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা মেনে নেবেই। জোর করকার, ভয় দেখাবার, ঘৃণা করবার, হিংসা করবার কোনো দরকারই হবে না। তেমনি অল্প সংখ্যকের যদি কিছু ভাল থাকে—অধিক সংখ্যক একদিন না একদিন তা মেনে নেবেই। ধরা যাক, অধিক সংখ্যক অভদ্র, অল্প সংখ্যক ভদ্র। অধিক সংখ্যক ঈশ্বর মানেন, অল্প সংখ্যক

মানেন না। অধিক সংখ্যক অশিক্ষিত, অল্প সংখ্যক শিক্ষিত। অধিক সংখ্যক শান্তিকামী, অল্প সংখ্যক যুদ্ধবাজ। অধিক সংখ্যক কুসংকারাচ্ছন্ন, অল্প সংখ্যক প্রগতিশীল। অধিক সংখ্যক সমাজবাদী, অল্প সংখ্যক রাজতন্ত্রবাদী। অধিক সংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ, অল্প সংখ্যক সুনীতিপরায়ণ। অধিক সংখ্যক এক বিবাহের পক্ষপাতী, অল্প সংখ্যক বহু বিবাহের পক্ষপাতী।

চিরকাল মানুষ বুদ্ধি বিবেচনা বিদ্যা তর্ক বিচার চুক্তি সমঝোতার মাধ্যমে সমাজ বিবর্তনে অংশ গ্রহণ করেছে। সব ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতবাদ সংখ্যালঘিষ্ঠের মতবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়—একথা মেনে নিয়েছে। ভাল মন্দের কষ্টি পাথরে সংখ্যাগরিষ্ঠের আর সংখ্যালঘিষ্ঠের মতবাদ কষে দেখেছে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্রে এই নিকষিত পদ্ধতিটা, এই পক্ষপাতিত্বহীন বোধটা সমগ্র জনসাধারণের পক্ষে কল্যানকর।

O সাতাশ O

মানুষ মাত্রেই শ্রমিক।

বাঁচতে গেলে কিছু না কিছু শ্রম করতেই হয়। শ্রম করতে হয় নিজের জন্যে অথবা সংসারের জন্যে অথবা সমাজের জন্যে অথবা বৃহত্তর সমাজ বা রাষ্ট্রের জন্যে অথবা সমগ্র পৃথিবীর জন্যে।

বনেদটা বাদ দিয়ে দশ তলার ছাদটার কল্পনা করা যায় না। ব্যক্তিগত মানুষটাকে বাদ দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর কথা ভাবাই যায় না। তাবৎ জনসাধারণের কথাও।

বিদ্যাবুদ্ধির শ্রম যাঁরা করছেন—তাঁরাও শ্রমিক। আবার কাস্তে নিয়ে যাঁরা শ্রম করছেন—তাঁরাও শ্রমিক। তেমনি লেখাপড়ার শ্রম যাঁরা করছেন—তাঁরাও শ্রমিক। আবার হাতুড়ি নিয়ে

যাঁরা শ্রম করছেন,—তাঁরাও শ্রমিক। তেমনি অফিস কাছারিতে শ্রম যাঁরা করছেন—তাঁরাও শ্রমিক। আবার ঘর গৃহস্থালীতে শ্রম যাঁরা করছেন—তাঁরাও শ্রমিক। তেমনি আধ্যাত্মিক সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্যে যাঁরা শ্রম করছেন—তাঁরাও শ্রমিক।

তাই ষ্টেটের বা রাষ্ট্রের জন্যে যাঁরা শ্রম না করেন তাঁদের শ্রমিক বলা যায় না—একথা যাঁরা বলেন, বুঝতে হবে মার্কসীয় বুজরুকিতে তাঁরা বিভ্রান্ত।

O আঠাশ O

গণতন্ত্রের যা কিছু ভাবনা চিন্তা, কাজ কর্ম, আইন শৃঙ্খলা, বিধি ব্যবস্থা—সবই তো জনসাধারণের জন্যে। এখন প্রশ্ন : যিনি জনগণের প্রকৃত নেতা হবেন, তিনি জনগণের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে কাজ করবেন, না জনগণের প্রভু হয়ে হুকুম চালাবেন ?

আমার অভিমত : প্রকৃত নেতা জনগণের ভৃত্যও হবেন না অথবা প্রভুও হবেন না। তিনি হবেন জনগণের দরদী বন্ধু। তিনি হবেন দেশের বন্ধু। তিনি হবেন জনগণের দরদী দেশবন্ধু।

O ঊনত্রিশ O

জীবন, পৃথিবী আর মানুষের চিন্তাধারায়—সর্বত্রই সেই দ্বৈত ভাব।

লাল সাদা। হিংসা অহিংসা, অন্ধকার আলো, মৃত্যু জন্ম, অজ্ঞানী জ্ঞানী, অসাধু সাধু, নরক স্বর্গ, নিরাশা আশা, অসতী সতী, বাম দক্ষিণ, দুঃখ সুখ, অসুস্থ সুস্থ, ধ্বংস সৃষ্টি, যুদ্ধ শান্তি, বিরহ

মিলন, অনিয়ম নিয়ম, বিশৃঙ্খলা শৃঙ্খলা, অসভ্য সভ্য, পশুত্ব মানবত্ব, অকল্যাণ কল্যাণ, অশুভ শুভ, অন্যায় ন্যায়, অবিবেচনা বিবেচনা, আমিষাশী নিরামিষাশী, অভদ্র ভদ্র, অশিক্ষা শিক্ষা, নির্বোধ বুদ্ধিমান।

কালো সাদা। গরীব বড়লোক, সর্বহারা সর্বগ্রাসী, রাত্রি দিন, পরাজয় জয়, নাবালক সাবালক, ব্যর্থতা সার্থকতা, লোকসান লাভ, দুর্বল সবল, শ্রমিক মালিক, বিচ্ছিন্নতা একতা, কুৎসিৎ সুন্দর, শয়তান ভগবান, চরিত্রহীন চরিত্রবান, ভোগ ত্যাগ, আসক্তি অনাসক্তি, অকল্যাণ কল্যাণ, অসৌজন্য সৌজন্য, গৃহহারা গৃহবাসী, অশিষ্ট শিষ্ট, অশিক্ষিত শিক্ষিত, দুর্নীতি নীতি, অবিচার বিচার, অসৎ সৎ, পাপী ধার্মিক, অধর্ম ধর্ম।

সবুজ সাদা। তুমি আমি, স্ত্রী স্বামী, কন্যা পুত্র, মাতা পিতা, রক্ষণশীল প্রগতি, অনুদারতা উদারতা, পরাজয় জয়, দুঃখী সুখী, নিরানন্দ আনন্দ, কান্না হাসি, অশান্ত শান্ত, রাগ অনুরাগ, নির্দয় সদয়, চঞ্চল অচঞ্চল, হিসেবী বেহিসেবী, শত্রুতা মিত্রতা, অবিশ্বাস বিশ্বাস, ঘরমুখো বারমুখো, অনাদর্শ আদর্শ।

নীল সাদা। দুর্বলতা দৃঢ়তা, কুসংস্কার সংস্কার, সংকীর্ণতা উদারতা, শ্বাস নিশ্বাস, দেহ মন, অসংযম সংযম, মিথ্যাচার সদাচার, লৌকিক অলৌকিক, অভক্তি ভক্তি, অনিত্য নিত্য, অর্থ অর্থহীনতা, ঘৃণা প্রেম, বিদ্বেষ ভালবাসা।

হলদে সাদা। উগ্রপন্থী নরমপন্থী, অস্বাভাবিক স্বাভাবিক, অসামাজিক সামাজিক, বন্য গৃহস্থ, উষ্ণ শীত, বল প্রয়োগ বুদ্ধি প্রয়োগ, তরবারী কলম।

সর্বত্রই এই দ্বৈতভাব। সর্বত্রই এই পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ। কিন্তু এই সংঘর্ষকে যথাসম্ভব এড়াতে হবে। এই বিরোধ শক্তিদ্বয়কে যথাসম্ভব কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। চিরস্থায়ী সুখ শান্তি সমৃদ্ধি প্রগতি আর 'আনন্দকে রক্ষা করবার জন্যে প্রয়োজন একটা মাঝামাঝি পথের হদিস করা। কোন পক্ষকেই নিজের জেদ ধরে বসে থাকলে চলবে না। একটু নমনীয় হতে হবে।

একটু কমনীয় হতে হবে। একটু নাতিশীতোষ্ণ হতে হবে। একটু মধ্যবিত্ত হতে হবে। একটু ফিকে লাল, কালো, সবুজ, নীল আর হলদে হতে হবে। একটু ফিকে গ্রে, স্কাই ব্লু, ফিকে সবুজ, ফিকে হলদে হতে হবে।

আমার অভিমত : শান্তির জন্য শুধু অদ্বৈতবাদী না হয়ে মিশ্রবাদী হতে ক্ষতি কি।

০ ত্রিশ ০

তবু ভাল লাগে।

ভাল লাগে কাছে বসতে, কথা বলতে, কিছু শুনতে, কিছু শোনাতে, কিছু আঘাত দিতে, কিছু আঘাত পেতে।

এত নিন্দে, এত অপবাদ, এত উপহাস, এত কটুক্তি।

তবু ভাল লাগে।

ভাল লাগে প্রশ্ন করতে : শরীর কেমন ?

ভাল লাগে উত্তর শুনতে : এক রকম।

ভাল লাগে এই রায়টুকু জানাতে : আর আমাদের দেখা হওয়া উচিত নয়।

ভাল লাগে সেই রায়টুকু মেনে নিতে : আর আমাদের দেখা হবে না।

তবু দেখা হয়। তবু কথা হয়।

কি খবর ?

এমনি এসেছিলাম এদিকে—কাজে।

আমিও। এমনি এসেছিলাম এদিকে—কেতাবের স্থানে।

দুজনেই হেসে ফেলি। দুজনেই দুদিকে চলে যাই।

বুঝতে পারি জীবনের অনেক প্রতীজ্ঞাই শুধু কথার কথা। আকুতির জগতে তার কানাকড়িও মূল্য নেই।

০ একত্রিশ ০

ধর্ম নিরপেক্ষ এক শাসনতন্ত্র শাসিত সমাজবাদী স্বাধীন প্রগতি-শীল আধুনিক ভারত রাষ্ট্রের অনেক ভণ্ডামীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ভণ্ডামী পৃথক হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের বিবাহ আইন। হিন্দু ও খৃষ্টানের আইন সঙ্গত এক বিবাহ। মুসলমানের আইন সঙ্গত বহু বিবাহ। পৈতে হিন্দু। অপৈতে হিন্দু। সিয়া মুসলমান। সুন্নি মুসলমান। বর্ণ হিন্দু। হরিজন হিন্দু। বাঙালী মুসলমান। অবাঙালী মুসলমান।

প্রকৃত সমাজবাদীকে এইসব একতা পরিপন্থী কৃত্রিম অবৈজ্ঞানিক বিভেদমূলক ভণ্ডামীর মুখোস নির্দয় নির্মম হাতে খুলে ফেলতে হবে। সমাজকে সবদিক থেকে ঢেলে সাজাতে হবে। সর্বোপরি মানবধনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অর্থনৈতিক সমতা ছাড়াও ধর্মীয় ও সামাজিক সমতারও প্রয়োজন আছে। তবেই সমাজবাদ তার প্রকৃত সার্থকতার পথ খুঁজে পাবে। নইলে সোনার পাথর বাটি। আকাশ কুসুম স্বপ্ন। অরণ্যে রোদন।

০ বত্রিশ ০

সে অনেকদিন আগের কথা।

তখন আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা দু'জনেই ছাত্রছাত্রী। দুজনের শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু সমঝোতা হয়েছিল। সাহিত্য বাসরে এক সঙ্গে মোলাকাতও হত প্রায়ই। অবশেষে বাসর বন্ধুরা দু'জনকেই করলেন যুগ্ম সম্পাদক। পরিচয় শুরু হল।

এখন ও মস্ত সাহিত্যিকা। খুব সুনাম চারিদিকে। হঠাৎ দেখা খানদানী মোগলাই হোটেলে। প্রায় বিশ বছর পরে। প্রথমে দুজনে দুজনকে চিনতেই পারিনি। দৈহিক পরিবর্তনটা আমার চেয়ে ওর অনেক বেশী। অথচ মৌখিক আদলটা প্রায় একই রকম আছে। তাই চিনতে পারলাম। প্রায় একই সঙ্গে যেন চীৎকার করে উঠলাম দুজনে :

আরে তুমি!

আরে তুমি!!

খুব মুটিয়েছ—প্রথমটা চিনতেই পারিনি।

তোমারও তো নেয়াপাতি ভুঁড়ি হয়েছে—তাই আমিও প্রথমটায় একটু ইতস্তত করছিলাম।

কেমন আছ?

দেখে কেমন মনে হচ্ছে?

ভাবনা চিন্তার বালাই নেই।

ঠিকই ধরেছ। পড়াশুনা আর লেখা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে হয়না। তুমি কেমন আছ?

দেখে কি মনে হচ্ছে?

তুমিই বল।

পড়াশুনা আর লেখা ছাড়া আর সব কিছুই ভাবতে হয়।

যেমন?

প্রাত্যহিক জীবনের তেল নুন লকড়ীর কথা।

প্রাণখোলা হাসি হেসে দুজনেই চেয়ার টেনে বসলাম। তখন বিস্ময় জড়তা আর সঙ্কোচের মেঘটা সম্পূর্ণ সরে গেছে। তখন দুজনেই সহজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ সাবলীল।

খেতে খেতেই কথা হচ্ছিল। তেল নুন লকড়ীর কথা দু'এক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। শুরু হল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব আর পুরুষত্বের যথার্থ রূপায়ণ কেমন হওয়া উচিত—সেই নিয়ে দুচার কথা।

আমার অভিযোগ : আজকের দিনের বাংলা সাহিত্যে নারীত্বের পরিপূর্ণতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে না। নারীত্বের একটা সাবেক জাতীয় প্যাটার্ণ নিয়েই আজকের দিনের অধিকাংশ সাহিত্যিক্যই মগ্ন। দিন-বদলাচ্ছে—নারীত্বের প্যাটার্ণও বদলাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে নারীর মর্মলোকে ফুটে উঠতে চাইছে কি এক বিদ্বেষহীন নারীত্বের আকুতি—সেটা জানাবার এতটুকু গরজ নেই অনেক সাহিত্যিকেরই।

সাহিত্যিকার সহাস্য উত্তর : বাসরে কি সাংঘাতিক অভিযোগ তোমার। নারীর মর্মলোকে প্রবেশ করতে যখন দেবতারাও হিমসিম খেয়ে হার স্বীকার করেন তখন সাধারণ লোকরা সেই অসাধ্য সাধন করবে—এইটাই তুমি বলতে চাও? চুলোয় যাক—মেয়েদের মনের কথা মনেই থাক। কাজ কি তাকে বাইরে প্রকাশ করে সহজ নারীত্বের সৌন্দর্যটাকে নষ্ট করে। ঐ আড়াল-টুকু, ঐ গোপনীয়তাটুকু, ঐ রহস্যময়তাটুকুই তো প্রকৃত নারীত্বের সৌন্দর্য।

আমার প্রতিবাদ : কিন্তু ওটা নারীত্ব নয়। যেমন একমাত্র শৃংগার রসকেই সকল রসের সার বলা যায় না। বড় জোর বলা যেতে পারে রসের আদি পর্ব বা প্রাথমিক রস বা সমগ্র রসাস্বাদনের আংশিক মাত্র। তেমনি নারীর ঐ আড়ালটুকু বা গোপনীয়তাটুকু বা রহস্যময়তাটুকু অথবা প্রাথমিক অথবা আংশিকমাত্র অর্থাৎ আদি সমগ্র নারীত্বের সৌন্দর্যের ভগ্নাংশ ছাড়া কিছু নয়। আমার আসল বক্তব্য নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের আরো অনেক দিক রয়েছে যেটা বর্তমান বাংলা সাহিত্যে অনুপস্থিত অথবা উপেক্ষিত অবহেলিত দ্বিধাগ্রস্থ অথবা অকিঞ্চিৎ প্রয়োগে অপমানিত লাঞ্ছিত। নারীত্ব বলতে আজকের সাহিত্যে যা দেখছি তার গড় হিসেবটা হচ্ছে দেহসর্বস্বতা আর নগ্নতা। সমগ্র নারী সত্বার এটা একটা দিক হতে পারে—তার বেশী কিছু নয়।

সাহিত্যিকার কণ্ঠস্বরে গাঢ়তা : খুব ভাল লাগল তোমার

বিশ্লেষণটা। মন প্রাণ দিয়ে মেনে নিলাম। চেষ্টা করব পরের উপন্যাসটায় পরিপূর্ণ নারীত্বের একটা ইংগিত দেবার। তোমাকে এককপি প্রেজেন্ট করব—ভাল করে পড়ে সমালোচনামূলক একটা চিঠি লিখো। খারাপ হলে বলো কেন খারাপ আর ভাল হলে কেন ভালো। চেষ্টা করব সংশোধন করে নিতে। এবার আমার জিজ্ঞাসা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কি সত্যিকারের পুরুষত্বের চিত্র অঙ্কিত হচ্ছে? যদি বলি শুধু পৌরুষ দিয়েই পরিপূর্ণ পুরুষত্ব নয়—অস্বীকার করবে?

উত্তরটা প্রায় উচ্চারিত হতে চাইছিল। তবু সংযত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম: পরিপূর্ণ পুরুষত্ব বলতে তুমি কি বোঝ?

বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সুর সাহিত্যিকার গলায়: গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজো করব। তোমার নারীত্বের থিওরীই পরিপূর্ণ পুরুষত্বেরও থিওরী এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পুরুষত্ব শুধু পৌরুষ নয়—শুধু বাহাদুরি নয়—শুধু বাহাবা পাবার, শুধু হাততালি পাবার, শুধু হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণার প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার বস্তু নয়। ওটা পুরুষত্বের আংশিক বিকাশ মাত্র। পরিপূর্ণ পুরুষত্ব মিশে রয়েছে অহিংসা প্রেম দয়া মায়া মমতা ভালবাসা ত্যাগ তিতিক্ষা সহযোগিতা সহমর্মিতা—আরো কত কিছুর মধ্যে। প্রচলিত ধারণা পুরুষের সবটাই প্রকাশ্য—গোপনীয়তা আড়াল রহস্যময়তা বলে কিছু নেই। আমার মনে হয় এ ধারণাটা ঠিক নয়। পুরুষত্বেরও রয়েছে এক নিভৃত মর্মলোক—

আর লোভ সামলাতে পারলাম না: এবার আমাকে একটু গঙ্গাপূজো করতে দাও। থাকনা পুরুষের সে মর্মলোকের আড়াল-টুকু। কাজ কি তাকে বাইরে প্রকাশ করে সহজ পুরুষত্বের সৌন্দর্যটাকে নষ্ট করে?

দুজনেই হেসে উঠলাম। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

খাওয়া কখন শেষ হয়ে গেছে টের পাইনি। বয় কখন কফি দিয়ে গেছে। কখন তা ঠাণ্ডাও হয়ে গেছে। বেসিনে হাত মুখ

ধুয়ে এসে সেই ঠাণ্ডা কফিতেই চুমুক দিলাম দুজনে। মনে পড়ে গেল সেই বাইশ বছর আগেকার কফি হাউসের কথা। আড্ডা দিতে দিতে সাহিত্য আলোচনা করতে করতে সেদিনও এমনি কফি ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। খেয়াল হতে দুজনেই প্রাণখোলা হাসিতে কফি হাউস কাঁপিয়ে তুলতাম। ঠাণ্ডা কফিতে তাড়াতাড়ি চুমুক দিয়ে হিসেব নিকেশ মিটিয়ে দিয়ে যে যার বাড়ী ফিরে যেতাম। ঠিক আজকের মতোই। ঠিক আজকের মতোই দুজনে দুজনের চলে যাওয়াটা শেষবারের মতো দেখে নিতাম ঘাড় ফিরিয়ে। ঠিক আজকের মতোই মনটা কেমন উদাস অবশ উন্মনা হয়ে যেতো কয়েকটা মুহূর্ত।

০ তেত্রিশ ০

বর্তমান যুগে যেমন বিশুদ্ধ মার্কসবাদ অচল তেমনি বিশুদ্ধ গান্ধীবাদও। যুগোপযোগী সংস্কার শোধন পরিবর্তন পরিবর্ধন পরিমার্জন একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন দুটি মতবাদের জীবনধর্মী অংশগুলির সমন্বয় সাধন আর জীবন বিধর্মী অংশগুলির সম্পূর্ণ বাতিল করণ।

০ চৌত্রিশ ০

কোনো মানুষই জন্ম থেকে খারাপ নয়। অসম সমাজ ব্যবস্থার জন্যেই মাঝে মাঝে মানুষের কদর্য রূপ দেখতে হয়। কুৎসিত ক্রিয়াকলাপ সহ্য করতে হয়। অসভ্য কথাবার্তা শুনতে হয়। বৈজ্ঞানিক প্রায় সম সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের কদর্যতা তেমন চোখে পড়ে না।

০ পঁয়ত্রিশ ০

অকল্যাণকর রাজনীতিতে ভয়ের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। ভয় সৃষ্টি করে অনেক বড় বড় মাথাকে মাটিতে লুটিয়ে দেওয়া যায়। অনেক অহমিকাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা যায়। অনেক আস্ফালনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। অনেক একচেটিয়া কায়েমী স্বার্থকে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করা যায়। ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে প্রকৃত সমাজবাদী ভয়কে আর প্রশ্রয় দেবেন না। ভয়ের বদলে ভালবাসা দিয়ে সমস্ত মানুষের মনকে জয় করবেন। ভয় মৃত্যু। ভালবাসা জীবন।

০ ছত্রিশ ০

মনুষ্যত্বের যে অবমাননা প্রতিনিয়ত ঘটছে বর্তমান ভারতে—পরাধীন ভারতে তা কল্পনাও করা যায় নি। রাজনৈতিক ব্যাভিচার আজ মনুষ্যত্বের বস্ত্রহরণ করে চলেছে। মনে হয় মানুষকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অসভ্য বর্বর না করা পর্যন্ত এ পালোয়ানী প্রবৃত্তি নিরস্ত হবে না। শুধু মাত্র হিংসাকে আশ্রয় করেই এই দুর্যোধনী রাজনীতির জন্ম।

০ সাঁইত্রিশ ০

ঘৃণা—আর হিংসা ; যুদ্ধ, লোভ, অপপ্রচার, পরশ্রীকাতরতা—আর হিংসা ; শোষণ, কায়েমী স্বার্থ—আর হিংসা ; পক্ষপাতিত্ব,

আত্মীয় স্বজন পোষণ—আর হিংসা; একমাত্র বড়লোক বা গরীব তোষণ—আর হিংসা; সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবার বাসনা, সাধরণের ছোঁয়া বাঁচিয়ে পৈতে ধারণের কামনা—আর হিংসা আলাদা জিনিস নয়। বিষ্ঠার এ পিঠ ও পিঠ। তাই একমাত্র হিংসাকে স্বীকার করলে অনিবার্যভাবেই হিংসার মন্ত্রী সভাসদ পার্শ্বচর অনুচরদেরও স্বীকার করতে হয়। নইলে হিংসার রাজত্ব জমজমাট হয় না।

তেমনি উদারতা—আর অহিংসা; ক্ষমা, ত্যাগ, তিতিক্ষা—আর অহিংসা; সেবা, সহিষ্ণুতা, পরোপকার—আর অহিংসা; শান্তি, মৈত্রী, সৌভ্রাত্র—আর অহিংসা; কৃতজ্ঞতা, সম্মানবোধ—আর অহিংসা; সৌজন্য, শিক্ষা, ভদ্রতা—আর অহিংসা; নীতি, আদর্শ, মনুষ্যত্ব—আর অহিংসা; সাহায্য, সম্প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা—আর অহিংসা আলাদা জিনিস নয়। শ্বেতপদ্মের এ পিঠ ও পিঠ। তাই একমাত্র অহিংসাকে স্বীকার করলে অনিবার্যভাবেই অহিংসার অবিচ্ছেদ্য উচ্চতম প্রবৃত্তিগুলিকেও স্বীকার করতে হয়। নইলে অহিংসার প্রকৃত দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয় না।

কিন্তু জীবনে দু'টিরই প্রয়োজন আছে। সমাজে পাপ দুর্নীতি অন্যায় যখন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে তখন প্রয়োজন হিংসা, ঘৃণা, যুদ্ধ, লোভ, অপপ্রচার, প্রচলিত রীতিনীতি, আইন, শৃংখলার অস্বীকার, অসম্মান, পরশ্রীকাতরতা, পাশবিকতা আর হত্যার। পাপের যখন স্খালন হয় তখন প্রয়োজন অহিংসা, প্রেম, ভালবাসা, সেবা, সহযোগিতা আইন, শৃংখলা, সম্মান, গঠনমূলক কাজের অনুপ্রেরণার আর শান্তির। তাই শান্তির উপাসনা চিরদিনের। আর যুদ্ধের কামনা দু'এক-দিনের। তাই অহিংসার অকুতি সর্বযুগের। আর হিংসার প্রয়োজনীয়তা দু'এক বছরের—বড় জোর পাঁচ সাত বছরের। সাধারণ মানুষের ঐকান্তিক কামনা পৃথিবীতে চিরদিন শান্তি আর অহিংসা বিরাজ করুক। মানুষ অমৃতের পুত্র হয়ে উঠুক।

○ আটত্রিশ ○

কি কুক্ষণেই গিয়েছিলাম জজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। তুলকালাম কাণ্ড। কাক চিল উড়ে পালাবার মতো পরিস্থিতি। বিষয়বস্তু—একমাত্র বিদুষী বিবাহিতা কন্যার বেপরোয়া চলাফেরা, খামখেয়ালী ভাবভঙ্গী, আপত্তিকর কথাবার্তা। রিটায়ার্ড জজ সাহেব রেগেমেগে বললেন : আচ্ছা বলুন তো মশাই—এসব ব্যাপার কি ভাল—না শোভন—না সঙ্গত—না সম্মানজনক—না সমর্থনযোগ্য ?

আকাশ থেকে পড়ার অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম : পারিবারিক ব্যাপারে খুব বিব্রত হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে ?

জজ সাহেবের তখনও তেলেবেগুনের ভাব : হব না ? আপনি পারতেন ঠিক থাকতে ? দিনরাত্রি যদি আপনার চোখের সামনে আপনারই বিবাহিতা কন্যা সংসার স্বামী পুত্র সব ছেড়ে দিয়ে যতসব উটকো ছেলেদের সঙ্গে টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়—পারতেন সহ্য করতে ?

আকাশ ছেড়ে এবার কিছুটা মাটি স্পর্শ করলাম : আপনি এত বিজ্ঞ হয়ে সহ্য করতে পারছেন না—তখন আমি কি করে সহ্য করব ? তবে কি জানেন—যুগের হাওয়া। একটু আধটু এডজাষ্ট করে নিতেই হয়।

হাত দশ বারোর মধ্যে যেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটল : যুগের হাওয়া—এডজাষ্ট—এসব কি বলছেন আপনি ? যুগের হাওয়া বলে মাথায় সিঁদুর দেবে না ? যুগের হাওয়া বলে জামা কাপড়ের আব্রু রাখবে না ? যুগের হাওয়া বলে স্লাং ইউজ করবে ? যুগের হাওয়া বলে সব সময় বয় ফ্রেণ্ডের মাঝে মক্ষীরাণী হয়ে থাকবে ? আর এই যুগের হাওয়ার সঙ্গে এডজাষ্টমেণ্ট ? কি বলছেন আপনি ?

অতি সন্তর্পণে বিপদজনক এলাকার পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলাম : উনি তো খারাপ কিছু করছেন না। হয়তো চুলের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে প্রত্যেকদিন সিঁদুর দেওয়া পছন্দ করেন না। হয়তো কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত জামাকাপড়ে উনি স্বস্তি অনুভব করেন। হয়তো কথ্যভাষার সাবলীল গতিছন্দের জন্যে দু'একটা স্ল্যাং ইউজ করেন। হয়তো পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে একটু ভালবাসেন। উনি বিদেশের গল্প উপন্যাস নিশ্চয়ই কিছু পড়েছেন —বিদেশের সিনেমাও কিছু দেখেছেন—পরোক্ষে হয়তো তারই কিছুটা প্রভাব পড়েছে ব্যাক্তিগত জীবনে।

বিস্ফোরণের পর এখন শুধু ধোঁয়া : তাহলে ঘর সংসারের একটা ইজ্জত নেই ? আমার একটা—হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর আবার শুরু করলেন। এখন আর ধোয়াও নেই। পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে জজ সাহেবকে : আপনি ঠিকই বলেছেন—একটু আধটু এডজাষ্ট করে নিতে হবে। রিটায়ার করার পরে আমাকেও তো এডজাষ্ট করে নিতে হচ্ছে। যখন জজ ছিলাম তখন ভাবতেও পারিনি ছেঁড়া জামা সেলাই করে পরতে হবে কোনদিন। মোজা ছাড়াই তালতলার চটি পরতে হবে। আর্দালি ছাড়াই চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে হবে। মানুষের জীবন কি অদ্ভুত দেখুন। এই রাজা—এই প্রজা।

একটি দীর্ঘশ্বাসের বিরতি। তারপর আবার শুরু : তাহলে আপনি বলছেন এতে দোষের কিছু নেই ?

বিচারকের ভঙ্গিতে ফায়সলা করলাম : দোষের কি আছে ? সমাজ জীবনে কেউ কুনো মিনমিনে আনসোসাল কনজারভেটিভ—কেউ বা ফুর্তিবাজ সোসাল প্রোগেসিভ। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রাখতে হয় তাদের একটু সোসাল না হলে চলে না। আপনারই কথা ভাবুন না। আগে কত আনসোসাল কনজার-ভেটিভ ছিলেন। আর আজ আমার মতো একজন সাধারণের সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন—অমূল্য সময় নষ্ট করছেন। বৃহত্তর,

সমাজের রসাস্বাদনের জন্যে মন আজ আপনার ব্যাকুল হয়েছে—শুধু নিজের ঘর সংসার প্রিয় পরিজন নিয়েই আজ আপনার সমাজের পরিধি গণ্ডীবদ্ধ নয়। সভাসমিতিতে যাচ্ছেন—কত সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশছেন। বলুন তো এটা কি দোষের?

মুচকি হাসির দীপ্তিতে জজ সাহেবের মুখটি প্রদীপ্ত হল: আপনি বেশ কথা বলেন মশাই। আসবেন মাঝে মাঝে। আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাই।

বিচারকের বিচার শেষ করে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম। তারপরে কাজের কথাটা পাড়লাম। ওর বিবাহিতা কন্যার সঙ্গে জনৈক একটিং জজ সাহেবের খুব দহরম মহরম। কাজেই কোর্টে চাকরির জন্যে একটু সুপারিশ।

জজ সাহেব বললেন: মেয়ে আসুক বলব। যাই বলুন মশাই, মেয়েটা কাজ গোছাতে বিলকুল ওস্তাদ।

আমি মধুরেণ সমাপয়েৎ করলাম: কার মেয়ে দেখতে হবে তো।

জজ সাহেব বিগলিত আত্মগরিমায় মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

০ ঊনচল্লিশ ০

মেয়েদের প্রগলভতা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তাকে অসভ্যতা বলে। সংযত প্রগলভতা সবসময়েই পুরুষকে আকর্ষণ করে। প্রগলভতাহীন মেয়ে গন্ধহীন ফুলের মতো। আর সংযত প্রগলভতাযুক্তা মেয়ে রজনীগন্ধার মতো।

O চল্লিশ O

রাজনীতিতে সুবিধাবাদ ছাড়া অসুবিধাবাদ বলে কোন শব্দ নেই। তাই কোন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞকে সুবিধাবাদী বলে হেয় প্রতিপন্ন করা একটি অরাজনৈতিক চাল। যাঁরা অসুবিধাবাদী তাঁরা রাজনীতি করেন না। তপোবনে তপস্যা করেন। অথবা কোনো উন্মাদ আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

O একচল্লিশ O

ওদের দু'জনকে দুটি দৃষ্টিকোন থেকে দেখলাম। একই বৃন্তের যেন দুটি ফুল—কিন্তু কত বিচিত্র তার প্রকাশ। একই লেখকের যেন দুটি উপন্যাস—কিন্তু কত বিচিত্র তার বিন্যাস, কত বিচিত্র তার ভঙ্গিমা। আজ বলা শক্ত কাকে বেশী ভাল লেগেছিল। আজ বলা শক্ত কোন রাগিনীটা কানে সবচেয়ে মধুর হয়ে বেজেছিল। তাই আজ এই অকপট স্বীকারোক্তি : ভাল লেগেছিল দুজনকেই। ভাল লেগেছিল জয়-জয়ন্তী আর পুরিয়া-ধানেশ্রী। ভাল লেগেছিল অপরাজিতাকে। ভাল লেগেছিল তনুশ্রীকে। অথবা দুয়ে মিলে সেই এক অপরাজিতা তনুশ্রীকে।

তবু অপরাজিতার ব্যাকুলতা : কি দেখেছিলে তনুশ্রীর মধ্যে ?

আমার জবানবন্দী : হয়তো আমার ভাল লাগাকে, আমার ভালবাসাকে, আমার প্রেমকে।

আর সেই একই আকুলতা তনুশ্রীর কণ্ঠে : কি পেয়েছিলে অপরাজিতার মধ্যে ?

আমার জবানবন্দী : হয়তো আমার প্রয়োজনের জগৎটাকে,

আমার বাস্তবধর্মিতাকে, আমার তেল নুন লকড়ীর ভাবনা চিন্তাকে।

তবু ওদের নিভৃত একক জিজ্ঞাসা : পার না শুধু একজনকে আত্মার আত্মীয় করে নিতে? পার না শুধু একজনকে কাজের সঙ্গী করে নিয়ে সুখী হতে?

আমার উত্তর : না।

তবু সেই নিভৃত একক জিজ্ঞাসা : কেন?

আমার উত্তর : সেই সৃষ্টির আদিম রহস্য—আমি বহু হব। আমার সকল সত্ত্বাকে দুটি মৌলিক বিপরীতধর্মী সত্তার মধ্যে প্রতিভাত হতে দেখব—তবেই আমি সম্পূর্ণ হব। আমি সুখী হব।

অপরাজিতার প্রশ্ন : রূপে গুণে আর্থিক সম্পদে ও কি আমার চেয়ে বেশী সম্পদশালিনী?

আমার উত্তর : না। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে ও। কিন্তু অপার্থিব এক মহাসম্পদে ও বিভূষিতা। সেই মহাসম্পদের নাম মনুষ্যত্ব। দুঃখ কষ্ট বিপদের দিনে পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে জানে। আর তোমার সান্নিধ্য—সুখ আনন্দ সম্ভোগ আর প্রাচুর্যের দিনে। আর জান, সেই প্রাচুর্যের দিনে বেশী করে মনে পড়ে ওকে। মন অনুসন্ধান করে ফেরে ওকে কিছু সুখ আনন্দ আর সম্ভোগের ভাগ দিতে।

প্রশ্ন : ও কি আমার চেয়ে বিদুষী?

উত্তর : না। সাধারণ শিক্ষিতা। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত ওর মার্জিত মনটা—যে মনটা হিংসা বিদ্বেষ লোভ লালসা স্বার্থপরতা আর ঘৃণায় কলুষিত নয়। লাভ লোকসানের হিসেব না করে ও মানুষকে ভালবাসে। আর এইখানেই দুনিয়ার ডক্টরেট বিদুষীরা ওর কাছে হার মানে।

প্রশ্ন : ওর সামাজিক সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি কি আমার চেয়ে বেশী?

উত্তর : না। আগেই বলেছি ও সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। একটা অতি ক্ষুদ্র সমাজের সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি

বাড়াতে গিয়ে নিজের সমাজের—যে সমাজ অসংখ্য মধ্যবিত্ত নিয়ে গঠিত—তার মুখের গ্রাসে ভাগ বসাতে পারবে না। তাই ও সহজ হতে জানে, স্বাভাবিক হতে জানে। নিজের করে কাছে টেনে রাখতে পারে সম্পূর্ণ অপরিচিতকেও অনেকক্ষণ। প্রভাব প্রতিপত্তি মান সম্মানের বেড়াজাল দিয়ে মানুষের ভালবাসার সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরটাকে ও ঘিরে রাখতে চায় না। ওর শ্রেষ্ঠ প্রভাব প্রতিপত্তি মান সম্মান অসংখ্য মানুষের ভালবাসার মধ্য দিয়ে সহজভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তুমি জান না মানুষ মাত্রই ভালবাসার কাঙাল। আর এই ভালবাসার অভাবেই কত মানুষ বন্য হিংস্র কুটিল জটিল কুৎসিৎ হয়ে উঠেছে। পৃথিবী কত অসুন্দর কত কদর্য কত বিভৎস হয়ে উঠেছে। কিন্তু ও জানে জীবন আর পৃথিবীর এই গূঢ় রহস্যটা। ও জানে বন্য পুরুষকেও কি করে ভালবাসা দিয়ে প্রেম দিয়ে সেবা দিয়ে সাহচর্য দিয়ে উদারতা দিয়ে ক্ষমা দিয়ে ধৈর্য দিয়ে শান্ত সমাহিত করে তুলতে হয়। কি করে ভালবাসার কাঙাল করে তুলতে হয়। কি করে ভালবাসতে হয়। তুমি কটুভাষিনী আর ও প্রিয়ভাষিনী। তুমি জান না গর্ব অহংকার শক্তিমত্তার আগুনে ভালবাসা কি করে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু ও জানে দরদীয়া মন নিয়ে মরমীয়া হয়ে উঠে কি করে পুরুষকে ভালবাসতে হয়। তুমি জান না কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। কিন্তু ও জানে কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না। তোমার মন ছাড়া আর কিছুই দেবার নেই। কিন্তু ও মনের মাধুরা মিশিয়ে সব কিছুকে সমর্পন করে আত্মসমর্পন করতে চায়। তুমি অশেষ গুণবতী কিন্তু একটি মহা দোষ—ঘৃণা। মানুষকে তুমি ঘৃণা কর। অমানুষও যদি কোটিপতি হয়—তাকে তুমি ভালবাস। আর ঐ একটি দোষে তোমার সব গুণ বরবাদ—সব শুচিতা পবিত্রতা নিয়ম নিষ্ঠা সতীত্ব ধূলিসাৎ। আর ওর অনেক দোষ—আর একটি মাত্র গুণ—ভালবাসা। মনুষ্যত্বকে ও অর্থের মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করতে চায় না।

আর ঐ একটি গুণে ওর সব পাপ চরিত্রহীনতা স্খালন হয়ে যায়। তুমি যেন রাত্রি—অপ্রত্যক্ষ সীমাহীন গোপন গভীরতায় নিমগ্না। সব কিছু ঠাহর করতে হয় অতি সন্তর্পণে। ও যেন দিন—প্রকাশ্য প্রত্যক্ষ স্পষ্টতায় দীপ্তিময়ী। নির্ভীক পদক্ষেপে এগিয়ে চলা যায় অনেক দূরে। একত্রে।

কি অদ্ভুত অসামঞ্জস্য তোমাদের দু'জনের মধ্যে। তবু আমার দ্বৈত সত্বায় পাই সামঞ্জস্যের এক অভূতপূর্ব সাড়া।

তুমি আপনজনকে পর করতে ভালবাস আর ও পরকে আপন করতে ভালবাসে। তুমি কি এক অস্বাভাবিক গোপনীয়তায় সব সময় নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাখতে চাও। আর ও সহজ স্বাভাবিক প্রকাশের মধ্যেই নিজেকে উদ্ঘাটিত করতে চায়। তুমি মনের কথা মুখফুটে বলতে পারনা। আর ও মুখের কথা মন খুলে বলতে পারে। তুমি পেয়েছ বিভিন্ন কেতাবের জ্ঞান। আর ও পেয়েছে বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মেশবার বিজ্ঞানটুকু। তুমি পার্থিব সুখভোগকে তুচ্ছ করে অপার্থিব আনন্দে নিমগ্ন হতে চাও। আর ও অপার্থিব আনন্দকে অগ্রাহ্য করে পার্থিব সুখভোগকে আঁকড়ে ধরতে চায়। তুমি একের মধ্যে অনেককে প্রত্যক্ষ করতে চাও আর ও অনেকের মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করতে চায়। তুমি সতীত্বকে রাজ-সিংহাসনে বসাতে চাও। আর ও নারীত্বকে সাধারণ আসনে বসাতে চায়। তুমি গাম্ভীর্য গাঢ়তায় নিমগ্ন হতে চাও। আর ও নারীত্বের স্বভাব সুন্দর প্রগলভতায় চটুলতায় দুলে উঠতে চায়।

বুঝতে পারি তোমার শক্তি অসীম। বুঝতে পারি তুমি আমার সত্বার অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছ। আর অর্ধেকটা? মনে পড়ে ওকে। মনে পড়ে তোমাকে। মনে পড়ে দুজনকেই। মনে পড়ে সেই একদিন যেদিন আমি মাঝখানে বসে আর আমার বাঁ দিকে তুমি —যেন সতীত্বের প্রতিমূর্তি আর ডান দিকে ও—যেন নারীত্বের প্রতিমূর্তি। সেদিন কেউ কিন্তু কোন কথা বলতে পারিনি। শুধু অনুভব করেছিলাম : আমি যেন সব পেয়েছি। জীবনে অপূর্ণ

সাধ বলে আর কিছু নেই। আমি সম্পূর্ণ। আমি সুখী। আমি শান্ত। আমি সমৃদ্ধ। আমি আর একা নই। আমি আছি, তুমি আছ আর ও আছে।

তবু তোমাকে ভাললাগে। তবু তোমাকে ভালবাসি। কেন জান? শুধু ছন্দ সুর আনন্দ সম্ভোগ ভালবাসা প্রেম দিয়ে তো মানুষের সত্তার পরিপূর্ণতা নয়। মানুষের অর্ধেক সত্তাটা আজও পাশব প্রবৃত্তির উদভ্রান্ত তাড়নায় অস্থির চঞ্চল। তাই অর্থের প্রয়োজন হয়, স্বার্থের প্রয়োজন হয়। হিংসা ঘৃণা লোভ লালসা কদর্যতার পঙ্ককুণ্ডে মানুষকে নেমে আসতে হয়। সংসারের বুভুক্ষিত মানুষগুলোর মুখে অন্নের সংস্থান করতে হয়। অর্থ রোজগারের অসহনীয় প্রতিযোগিতায় নাম লেখাতে হয়। তখন তোমাকে মনে পড়ে। তখন তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। ভালবাসি। আসন্ন বিপত্তির হাত থেকে রেহাই পাই। কৃতজ্ঞতায় মনটা উদ্বেল হয়ে ওঠে। প্রিয় পরিজনদের মুখগুলি আবার স্বর্গ সুসমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

০ বিয়াল্লিশ ০

বাংলা দেশে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সাম্যতত্ত্বের প্রথম বীজ যাঁরা রোপন করেন—তাঁদের মধ্যে চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণই অন্যতম শ্রেষ্ঠ। আর সেই সদ্য উন্মেষিত চারা গাছটি যাঁরা সযত্ন প্রয়াসে রক্ষণা বেক্ষণ করেন—তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দকে। তারপর সেই ফলবান বৃক্ষটির দিকে যাঁরা ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রের।

০ তেতাল্লিশ ০

অকল্যাণকর মানবতাবিরোধী শক্তির সমন্বয়ে যে একতা— সেটা একতা নয়, শুধু সংখ্যাধিক্য। এই মূল্যহীন সংখ্যাধিক্য বা মেজরিটির নেতৃত্ব যারা করে—তাদের রুচি ক্রিয়াকলাপ কথাবার্তা খুব নিম্নস্তরের না হয়েই পারে না। যে চলচ্চিত্র পরিচালকের লক্ষ্য শুধু যৌন উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়ে বক্স অফিস হিট করা— সে কোনদিন প্রথম শ্রেণীর রসজ্ঞ সুপরিচালকের সম্মান অর্জন করতে পারে না। তেমনি কল্যাণকর মানবতাপূজারী শক্তি সমন্বিত যথার্থ একতাবদ্ধ সংখ্যালঘু বা মাইনরিটির প্রতি যে নেতা শ্রদ্ধাহীন —সেও কোনদিন যথার্থ নেতার সম্মান অর্জন করতে পারে না। মানুষকে জানোয়ারে পরিণত করব—তার জন্যে আবার নেতৃত্বের কি প্রয়োজন? তার জন্যে যে কোন একটি তৃতীয় শ্রেণীর গুণ্ডা বা বদমায়েসই যথেষ্ট। মানুষকে অমৃতের পুত্র করে গড়ে তুলব— যথার্থ নেতৃত্বের সার্থকতা তো সেইখানেই।

০ চুয়াল্লিশ ০

আত্মসংযমটা আত্মনিপীড়ন নয়। বল্লাহারা আত্মবৈচিত্র্যের কেন্দ্রীভূত ছয়টি রিপুর পরিমিত রসাস্বাদন।

০ পঁয়তাল্লিশ ০

পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন আর রাষ্ট্র জীবনকে সুস্থ সুখী সমৃদ্ধ আর প্রগতিশীল করে গড়ে তুলতে হলে—জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

জীবনে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আস্বাদ পেতে হলে—জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

কলহ বিবাদ বিসম্বাদ আর পররাজ্য গ্রাস বা যুদ্ধকে পরিহার করতে হলে—জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

হিংসা ঘৃণা পরশ্রীকাতরতা লোভ দ্বেষ বিদ্বেষের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করতে হলে—জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজস।

০ ছেচল্লিশ ০

রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি আমার খুব ভাল লাগে—“দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে—ডাইনে বাঁয়ে।” প্রায়ই গুণগুণ করে গাইতে ইচ্ছে হয়। প্রায়ই প্রাণখুলে গেয়ে শোনাতে ইচ্ছে হয় দশজনকে। পারি না।

বামপন্থী আর ডানপন্থী রাজনৈতিক দলভুক্ত পাণ্ডারা বড় উৎপাত করে। বলে : তুমি সুবিধাবাদী। হয় ডানদিকে এস—না হয় বাঁদিকে। দু'দিকে থাকা তোমার চলবে না।

আমি বলি : তা কি করে সম্ভব? ডানপন্থী আর বামপন্থীর মধ্যে আমার কত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব রয়েছেন। প্রত্যেকদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়—ভাবের আদান প্রদান হয়। তাঁদের সঙ্গে আমার কত লোক লৌকিকতা কুটুম্বিতা। তাঁরা

বিপদে আপদে আমাকে কত সাহায্য করেন। হাতে পয়সা না থাকলে কত ধর্না দিই তাঁদের কাছে। এত প্রেম এত ভাব ভালবাসা এত স্নেহ মমতা এত দয়া দাক্ষিণ্য—এ সব কথা ভুলে কেমন করে তাঁদের সঙ্গে আড়ি করব। কেমন করে অকৃতজ্ঞতার প্রাচীর তুলে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে দেব? ডানপন্থী আর বামপন্থী বলে তাঁদের একঘরে করে দেব? তবে একান্ত যদি না ছাড়—আমার অর্ধাঙ্গিনীকে বামপন্থীর খাতায় নাম লেখাতে বলতে পারি আর আমি ডানপন্থীর খাতায় নাম লেখাতে পারি। এবং কালের মন্দিরা এইভাবেই বাজিয়ে চলি। এইভাবেই সমুদ্র মন্থন হোক। এইভাবেই গরল আর অমৃত পান করে যাই। তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের কোন আপত্তি থাকবে না?

তাকিয়ে দেখলুম ঘরখানি ক্রমশঃ শ্রোতাশূন্য হয়ে গেল। একজন ডানপন্থী বা বামপন্থীকেও আর ত্রিসীমানার মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

অর্ধাঙ্গিনী প্রবেশ করলেন। কণ্ঠস্বর ঝাঁঝালো : বসে বসে শুধু ডানপন্থী আর বামপন্থী করলেই চলবে? পেটের কথা ভাবতে হবে না? আজ রেশনের দিন—সেটা খেয়াল আছে?

অস্ফুট কণ্ঠস্বর আমার : আছে।

অর্ধাঙ্গিনী : গত হপ্তায় দু টাকা কম দিয়েছিলে—এ হপ্তায় কিন্তু পনের টাকাই চাই।

আমি : কিন্তু পকেট যে গড়ের মাঠ। মাত্র দশ টাকা সম্বল। একটু ম্যানেজ করে নাও না!

অর্ধাঙ্গিনী : ম্যানেজ করে নাও না—বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? আমি ম্যানেজ করব কেমন করে? আমি কি রোজগার করি? না রোজগার করবার মত দিয়েছ। চাকরী করতে চাইলেই তো বল প্রেষ্টিজে লাগবে। তাহলে ম্যানেজ করি কেমন করে? সত্যি প্রত্যেক মাসের এই টানাটানি আর ভাল লাগে না। এই সেদিনও মেসোমশাই এত করে বললেন চাকরিটা নেবার

জন্যে। সুখের চাকরি। কিন্তু তুমিই বাদ সাধলে।

আমি : আর বাদ সাধব না। মেসোমশাইকে বলো চাকরির ব্যবস্থা করতে। আর বলো—

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অর্ধাঙ্গিনী এক দুর্বার প্রাণচঞ্চলতায় অদৃষ্টপূর্ব এক দুষ্টুমিতে আমার ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

মুগ্ধ বিস্ময়ে দুজনে শুনতে পেলাম নীচের তলার রেকর্ড সংগীত : "দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে—ডাইনে বাঁয়ে।"

O সাতচল্লিশ O

ষ্টাটিস্‌টিক্স নাও—দেখবে ভারতে তথাকথিত অনেক প্রোলেটেরিয়াট অনেক বুর্জোয়ার চেয়েও বড়লোক। ষ্টাটিস্‌টিক্স নাও—দেখবে তথাকথিত অনেক বুর্জোয়া অনেক গরীবের চেয়েও গরীব। মনে রেখো—যেমন বাড়ীওয়ালা হলেই বড়লোক হয় না, তেমনি ভাড়াটিয়া হলেই গরীব হয়না। আমি অনেক ভাড়াটিয়াকে জানি যাঁদের মাসিক আয় পাঁচ হাজারেরও বেশী। আবার এমন অনেক বাড়ীওয়ালাকে জানি যাঁদের মাসিক আয় পাঁচশো টাকারও কম।

O আটচল্লিশ O

শুধু পৈতে ধারণ করলেই যেমন প্রকৃত মনুষ্যত্ব অথবা ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা যায় না—তেমনি শুধু জেল খাটলেই জননায়ক বা নেতা হওয়া যায় না। কিছু সৎ কাজ করা দরকার। আর সেই সৎ কাজটা হচ্ছে মানুষের সেবা করা, মানুষের উপকার করা আর মানুষের জীবনকে সুখময় আর শান্তিময় করে তোলা।

O উনপঞ্চাশ O

একদল বলছে : ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি করা, হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা, নিন্দা, অপবাদ রটনা করা, অশ্লীল কথা বলা, অসভ্য জীবনযাপন করা, অকৃতজ্ঞ, দয়া মায়া মমতাহীন হওয়াই নাকি জীবন ধর্ম। কিছু পেতে হলে এ ছাড়া বাঁরত্বের আর দ্বিতীয় পথ খোলা নেই।

অন্য দল বলছে : ভালবাসা প্রেম দয়া মায়া স্নেহ মমতা কৃতজ্ঞতা দিয়ে জীবনকে পরিশুদ্ধ করে সভ্য ভদ্র জীবন যাপন করে নিয়মানুবর্তী হয়ে আইন শৃংখলা মেনে চলে সব কিছুকে পেতে হয়। মানুষে মানুষে মিলনের—একতাবদ্ধ হওয়ার আর দ্বিতীয় পথ খোলা নেই।

এখন প্রশ্ন : কোন দল ঠিক বলছে?

আমার উত্তর : দু'দলই ঠিক বলছে। শান্তির সময় দয়া মায়া প্রেম প্রীতি দিয়ে সমাজকে গড়ে তুলতে হয়। আর যুদ্ধের সময় হিংসা ঘৃণা বিদ্বেষ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজকে ভেঙে ফেলতে হয়। শান্তি যদি দিন হয় আর যুদ্ধ যদি রাত হয়—তবে দুটিরই প্রয়োজন আছে মানুষের জীবনে।

O পঞ্চাশ O

টেলিফোনে রিং হলো। রিসিভার তুলে কানে দিলাম। পরিচিত কণ্ঠস্বর। "অপাঠ্য" সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্র নাগ'এর কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওদিক থেকে :

হ্যালো শনি…তোমাকে একটা মুস্কিল আসান করতে হবে… ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়…একটু নারী মহিমা সংকীর্তন… কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে…তবে খুলেই বলি…বছর বিশেক আগে "অপাঠ্য" যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন বোলপুর থেকে জনৈকা ভদ্রমহিলা "অপাঠ্য" মহাবিদ্যালয় জিজ্ঞাসিত…'সব মেয়েই সমান—একথা কেন বলা হয়'…এই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে পুরস্কৃত হয়েছিলেন…তিনি লিখেছিলেন…"সব মেয়ের পেটে কথা থাকে না—তাই"…তারপর নব কলেবর "অপাঠ্য" প্রকাশিত হলে ঐ প্রশ্নটারই আর কোন উত্তর হতে পারে কিনা, জানতে চাইলেন সেই ভদ্রমহিলাই…আমি "প্রশ্নবাণ" বিভাগে দশটি উত্তর পরপর সাজিয়ে দিলাম এবং লিখলাম এ ছাড়া আরো পাঁচশো হাজার উত্তর হতে পারে…সেইটাই হলো আমার আসল মুস্কিলের কারণ …ভদ্রমহিলা দশটি উত্তর পাঠ করে লিখলেন…আপনার দশটি উত্তর আমাদের এখানকার নারীমহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে…তাঁদের সবিনয় অনুরোধ কমপক্ষে ঐ ধরণের একশটি উত্তর আগামী সংখ্যা "অপাঠ্যে" প্রকাশিত করে নারী সমাজের অদম্য কৌতুহল যথকিঞ্চিৎ প্রশমিত করুন…আমরা এখানে সকলে অধীর আগ্রহে বাঞ্ছিত উত্তরের অপেক্ষায় কাল গুনছি…দয়া করে নিরাশ করবেন না…আপনাকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন…আমার তো ভাই এখন সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা… একে সময়াভাব তারপর সম্পাদকীয়তার গুরু দায়িত্ব…তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি…আর তাছাড়া বিচিত্র নারীচরিত্র সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা সর্বজন বিদিত…এখন বল…বিপন্ন বন্ধুর মুস্কিল আসান করবে কিনা…এবং আগামীকাল সন্ধ্যায় শনি ঠাকুর কৃত একশোটি উত্তরের কপি প্রেসে পাঠাতে পারব কি না…

আমি তো বেবাক অবাক। এমন অদ্ভুত সাহিত্যের অর্ডার জীবনে কোনদিন পাব কল্পনাও করিনি। এদিকে বিপদাপন্ন বন্ধুবর

অসহায় বোধ করছেন। ওদিকে বিষয়বস্তুটি শুধু জটিল নয়—দেবতাদের প্রতিভারও ওপর টেক্কা দেওয়া হয়—যদি নারী চরিত্র সম্পর্কে হলফ্ করে কিছু বলতে যাই। তাই শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে জানালাম :

আমাকেও তুমি কম মুস্কিলে ফেললে না…এর চেয়ে যদি তুমি বলতে—আগুনে ঝাঁপ দিতে…তাহলেও বোধ হয় এতটা বিপন্ন বোধ করতাম না…দেবতাদের বুদ্ধিরও অগম্য যা, তা নিয়ে কিছু লিখতে যাওয়া আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মসিজীবীর পক্ষে কম ধৃষ্টতা নয়…এ ধৃষ্টতা হয়তো তুমি ক্ষমা করবে…কিন্তু ঐ নারী মহল…যদি কিছু বিপদ ঘটে…সামলাবে তো…

বন্ধুবরের রসিকতা কানে ভেসে এল :

তোমার কাশীবাসের সমুদয় ব্যবস্থা আমি আগে থেকেই করে রেখেছি…লেখা প্রেসে পাঠিয়ে দেবার পরই তোমাকে সেপাই-সান্ত্রী সমেত সী অফ্ করতে যাব…তুমি নিশ্চিন্ত মনে লিখে যাও…

তারুণ্যে কাশীবাসের এমন শুভ প্রচেষ্টার সমাচার শ্রবণ করে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে হল না। পরম নিশ্চিন্ত হয়েই লিখতে শুরু করলাম :

মূল প্রশ্ন : সব মেয়েই সমান—এ কথাটা কেন বলা হয়?

বোলপুর নিবাসিনা ভদ্রমহিলা কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর :

(১) সব মেয়ের পেটে কথা থাকে না—তাই।

"অপাঠ্য" সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্র নাগ কৃত উত্তর :

(২) সব মেয়েই বয়েসের কথা জানতে চাইলে ক্ষেপে যান।

(৩) সব মেয়েরই বুক ফাটে তবু মুখ সহজে ফুটতে চায় না।

(৪) সব মেয়েরই মুখ যদি একবার ফোটে তবে সে মুখ আর সহজে বন্ধ করা যায় না।

(৫) সব মেয়েই পুরুষদের বোকা ভাবেন নিজেদের চেয়ে।

(৬) সব মেয়েরই রক্ত কণিকার সঙ্গে জেলাসী মেশানো থাকে।

(৭) সব মেয়েরই স্বামী ছাড়া একজন মনের মানুষ থাকে।

(৮) সব মেয়েই মুখে কথা বলেন দশ ভাগ আর আকারে ইঙ্গিতে প্রকারে ভঙ্গিতে ছলনায় প্রগলভতায় মানে চোখের জলে মুখের হাসিতে—সর্বোপরি চোখের ভাষায় কথা বলেন নব্বই ভাগ।

(৯) সব মেয়েরই আদিম আকাঙ্খা আমি মক্ষীরাণী হব—কিন্তু পুরুষ মক্ষীরাজ হবেন না।

(১০) সব মেয়েই সন্তানবতী হতে চান।

(১১) সব মেয়েই জানোয়ারের স্বপ্ন দেখেন।

শনি ঠাকুর কৃত বাকি উননব্বইটি উত্তর :

(১২) সব মেয়েই দ্বৈত স্বভাব বিশিষ্টা।

(১৩) সব মেয়েই থিয়োরী সর্বস্ব পুরুষের চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ পুরুষকেই বেশী ভালবাসেন।

(১৪) সব মেয়েই পুরুষের কাছে খোলা মন নিয়ে কথা বলতে পারেন না।

(১৫) ভালবাসার ক্ষেত্রে সব মেয়েই একটিমাত্র টেকনিক দু'দিন অনুসরণ করেন না।

(১৬) আমি অধরা, আমি সহজলভ্যা নই—এই মনোভাবটা সব মেয়ের মধ্যেই প্রবলভাবে বর্তমান। কুরূপা কুৎসিতারাও এর ব্যতিক্রম নন।

(১৭) সব মেয়েরই শ্রেষ্ঠতম এবং মধুরতম কামনা দৈহিক সম্ভোগ। কিন্তু এর সঙ্গে ভালবাসার খাদ না মেশালে ঘৃণাভরে তিনি যে কোম পুরুষকে যে কোন মুহূর্তে প্রত্যাখান করেন। শত সহস্র টাকাকড়ি, শাড়ী, গয়না আর প্রসাধনী দিয়েও এই ফাঁকটা পূরণ করা যায় না।

(১৮) মেয়েরা যাকে প্রকৃত আত্মার আত্মীয় বলে মনে করেন তাকে সর্বস্ব উজাড় করে দিতে চান। উজাড় করে দেনও।

(১৯) সব মেয়েরই সেই এক নীরব আকুতি—আমার মনের মানুষ শুধু আমাকেই দেখুক, আমার সর্বস্বকেই শুধু কবিতার মতো আবৃত্তি করুক, আমার কথাই শুধু ভাবুক, আমার অনুপ্রেরণায় শুধু অনুপ্রাণিত হোক—আর কারো দিকে যেন সে না চায়, আর কারো কথা যেন সে না ভাবে, আর কারো অনুপ্রেরণায় যেন সে না ভোলে। ওর ভাবনা চিন্তা শুধু আমিময় হয়ে থাকুক।

(২০) সব মেয়েই পুরুষদের চেয়ে একটু বেশী স্বার্থপর। আমার সংসার, আমার ছেলেমেয়ে, আমার স্বামী, আমার প্রিয় পরিজন—এই নিয়েই তাঁর স্বার্থপরতার রাজত্ব। তাই পৃথিবীতে এমন নজির খুব কম—নারী সম্পূর্ণ নিস্বার্থ হয়ে দেশত্যাগ করেছেন অথবা দেশপ্রেমিকা হয়েছেন অথবা প্রেমাস্পদকে না পেয়ে বিবাগী হয়েছেন অথবা আত্মহত্যা করেছেন।

(২১) একমাত্র দেহে এবং মনে অসুস্থ মেয়েরা ছাড়া, সব মেয়েই দেহগত কামনা বাসনার একনিষ্ঠ সেবিকা। তাই দেহ সম্পর্কে সব মেয়েই প্রখরভাবে সচেতন। সজাগ দেহ সংলগ্ন মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত।

(২২) দেহাতীত তত্ত্ব ও কচকচানিতে সব মেয়েরই প্রবল বিতৃষ্ণা। তাই কামগন্ধহীন নিকষিত হেম সদৃশ প্রেম মতবাদী কাব্যিক প্রেমিকের প্রতি কোন মেয়েই সহজে আকৃষ্ট হতে চান না। শুধু কবিতা সুধারস পান করিয়ে মেয়েদের দেহগত ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটানো যায় না।

(২৩) সব রূপবতী মেয়েরাই গুণবতী মেয়েদের চেয়ে একটু বেশী প্রগলভা, অস্থিরা আর চঞ্চলা। তেমনি সব গুণবতী মেয়েরাই রূপবতী মেয়েদের চেয়ে একটু বেশী গম্ভীরা, স্থিরা আর অচঞ্চলা।

(২৪) সব মেয়েই অভিনেত্রী। তাই অভিনয় বিদ্যাটা কোন মেয়েকেই শেখাতে হয় না। এটা জন্মগত। শুধু প্রতিভা স্ফুরণের জন্যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দিতে হয়।

(২৫) সপত্নীর অস্তিত্ব কোন মেয়েই সহ্য করতে পারেন না।

বাইরে সহ্য করবার ভান দেখালেও, ভেতরে তার প্রতিক্রিয়া অন্য রকম। ভেতরটা যেন তুষের আগুনের মতো প্রতিনিয়ত জ্বলতে থাকে। জীবনে যেন কিছুই ভাল লাগে না। আহার বিহার বিলাস ব্যসনে যেন প্রাণ থাকে না।

(২৬) সব মেয়েই নদীর মতো। কখন একূল ভাঙবে—ওকূল গড়বে অথবা কখন ওকূল ভাঙবে—একূল গড়বে—কিছুই বলা যায় না।

(২৭) প্রেমহীন ভালবাসাহীন স্বামীকে সব মেয়েই ঘৃণার চোখে দেখেন।

(২৮) মেয়েরা কি চান—পুরুষরা একশ বছরেও তা সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু পুরুষরা কি চান—মেয়েরা তা এক মুহূর্তেই বুঝে ফেলেন—এবং এ ব্যাপারে সব মেয়ের বিচক্ষণতাই সমান।

(২৯) সব মেয়েরই সুখের উৎস পুরুষ। দেবতার নাম উচ্চারণ করতেও ভুলিয়ে দেয় পুরুষের পৌরুষ। তখন পতিই হন দেবতা। পরম গুরু। তখন পতির আলয়ই হয় মহাতীর্থস্থান।

(৩০) দেহ সর্বস্বতা সম্পর্কে সব মেয়েই মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সজাগ সচেতন।

(৩১) প্রকৃত সুন্দরী মেয়েরা কি না করতে পারেন—যুদ্ধ বাঁধাতে পারেন আবার শান্তিও ফিরিয়ে আনতে পারেন। সব সুন্দরী মেয়েদেরই এই ভাঙাগড়ার নাট্য লীলাটুকু অপরিজ্ঞাত নয়।

(৩২) স্বামীত্বের বড়াই করে সব মেয়েই পরোক্ষে নিজেরই সৌভাগ্যের মহিমা কীর্তন গান অপরের মুখ থেকে শুনতে ভালবাসেন।

(৩৩) সব মেয়ে ভণিতা আর প্রগলভতায় জন্ম থেকেই ডক্টরেট।

(৩৪) সব মেয়েই প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সুন্দর রমনীয় করে তুলতে ভালবাসেন।

(৩৫) মেয়েদের মৌখিক "না"টা সবসময় আন্তরিক "না" নয়। প্রচ্ছন্ন আন্তরিক "হ্যাঁ"টা আত্মগোপন করে থাকে অনেক মৌখিক "না" এর মধ্যে। এ ব্যাপারে সব মেয়েরই চাতুরী সমান।

(৩৬) সব মেয়েরই পৃথক মনের কোন অস্তিত্ব নেই। মন ছড়িয়ে থাকে দেহের প্রতি রোমকূপে। তাই দেহ অচেতন মেয়ের মন নিস্পন্দ প্রতিধ্বনিহীন। তাই সর্বাঙ্গে শিহরণ তুললে মেয়েদের মন পুলকিত হয়। মুখে হাসি ফোটে। গানে গানে মুখরিত করে দেয় সারা দুনিয়াকে।

(৩৭) কর্মী পুরুষ সব মেয়েরই চির আকাঙ্খিত রত্ন বিশেষ।

(৩৮) অনুকূল অবস্থায় যে কোন মুহূর্তে মেয়েরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারেন। কারণ তিনি জানেন বিশ্বাসঘাতিনীকে আদর করে ঘরে তোলবার জন্যে ভদ্র সমাজে বহু কৃতবিদ্য পুরুষ লালায়িত। বিশ্বাসঘাতিনীকে সাম্রাজ্ঞীর সম্মান দিতে সভ্য ভদ্র পুরুষ সমাজ আজো ধন কুল মান পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত।

(৩৯) সব মেয়েই রহস্যময়ী আর ছলনাময়ী। তাই মেয়েদের সম্পূর্ণ বুঝতে পারার মতো পুরুষ আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নি।

(৪০) বিপরীতধর্মী পুরুষকে মুখে তাচ্ছিল্য করলেও—সেই পুরুষকেই মেয়েরা স্বপ্নে দেখেন বারবার।

(৪১) একেবারে সহজ স্বাভাবিক হওয়া সব মেয়েরই প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

(৪২) প্রতিমাসে মেয়েদের কামনা বাসনার আকাশ পাতাল তরঙ্গভঙ্গ ওঠে নামে। তাই ভালকেও খারাপ লাগে আর খারাপকেও ভাল লাগে। তাই দুর্দান্ত বেয়াদপকে কাছে টানতে ইচ্ছে করে। তাই শান্ত শিষ্ট নিরীহ গোবেচারীকে দূরে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

(৪৩) অতিবড় অসম্ভব কাজকেও সুদর্শনা মেয়েরা অতি ছোট আর সম্ভব কাজ বলে মনে করেন।

(৪৪) বস্তুগত লাভ—যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে মেটে-রিয়াল গেন—তার দিকেই নিরানব্বই ভাগ মেয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

(৪৫) ব্যক্তিত্বের পায়ে প্রণতি জানাতে সব মেয়েই ব্যাকুল। এর জন্যে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের সঙ্গে যত নীচে নামতে হয়, যত কৌশল অবলম্বন করতে হয়, যত তিরস্কার সহ্য করতে হয়—এমন কি কূল মান শীলও যদি ত্যাগ করতে হয়—ক্ষতি নেই। এ ব্যাপারে সব মেয়ের মনের তার একই সুরে বাঁধা।

(৪৬) প্রায় সমবয়সী পুরুষের সঙ্গে সব মেয়েরই স্বাভাবিক বন্ধুত্বটা সহজে গড়ে ওঠে। বিচার বিবেচনা করে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তার বয়েসের কোন গাছ পাথর নেই। সুন্দরী ষোড়শী চল্লিশোর্ধ ধনকুবেরের গলায় বরমাল্য দুলিয়ে দিয়েছেন—এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়।

(৪৭) সব কুমারী মেয়েরই ভাবনা চিন্তার কেন্দ্র বিন্দু বিবাহ।

(৪৮) মেয়েদের সৃষ্টি শক্তি ধ্বংস শক্তির চেয়ে প্রবলতর।

(৪৯) সব মেয়েরই কামনা বাসনা উত্তপ্ত লোহার মতো। অতি ধীরে ধীরে তা উত্তপ্ত হয়। অতি ধীরে ধীরে তা শীতল হয়। তাই মেয়েদের কামনা বাসনা সম্যকরূপে বুঝতে হলে পুরুষকে অপেক্ষা করতেই হয়। যিনি অপেক্ষা করেন না তিনি ঠকেন। মেয়েরা তাঁকে বলেন—একেবারে কিশোর। কিচ্ছু জানে না। বেকুব।

(৫০) বহু নারীভোগ্য পুরুষকে মেয়েরা কখনই হৃদয় রাজ-সিংহাসনে বসান না। কিন্তু বহু পুরুষভোগ্যা মেয়েকে পুরুষেরা হৃদয় সিংহাসনে বসান এবং সর্বস্ব সমর্পণও করেন।

(৫১) সব মেয়েই নয়নাভিরাম আভরণে আর অলংকারে সজ্জিতা হতে ভালবাসেন। উদ্দেশ্য—পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, পুরুষকে লোভাতুর করে তুলব, পুরুষের কর্মক্লান্ত জীবনকে কাব্যিক সুষমায় ভরিয়ে তুলব।

(৫২) যে পুরুষ মেয়েদের অতি নিকট সান্নিধ্যেও শুধু মনের

আরতি করেন—তিনি অনাত্মীয়। কিন্তু যে পুরুষ দেহের আবতি করেন—তিনি শুধ্ আত্মীয় নন, আত্মার আত্মীয়।

(৫৩) সব মেয়েই বিজয়িনীর ভূমিকায় বিশেষ পারদর্শিনী। পুরুষের দুর্বলতাটুকু তাঁরা চব্বিশ ঘণ্টাব মধ্যেই ধরে ফেলেন। তখন সেই দুর্বলতার সূত্রগুলি ধরেই চলে তাঁদের বিজয় অভিযান।

(৫৪) সব মেয়েই যেন সূর্যমুখী ফুল। ভালবাসার সত্য সূর্যের দিকে মুখ করে তাকিয়ে থাকেন সারা দিন, সারা জীবন।

(৫৫) সব মেয়েই অর্থহীন পুরুষের কাছে সতীত্বের মহিমা প্রদর্শন করতে চান না। কর্তা বলে স্বীকার করতেও নারাজ। নিজেকে আধার ভেবে সমর্পণ করতেও কুণ্ঠিতা।

(৫৬) একান্ত অনুগত পতিই সব মেয়ের দজ্জাল রূপটি বিকশিত হয়ে ওঠবার সুযোগ করে দেন। তাই সব দজ্জালরূপিনী মেয়েরা পতিকে থোরাই কেয়ার করেন। এমন কি প্রধান বিচারপতি পতিদেরও এইসব দজ্জালরূপিনীদের হাত থেকে রেহাই নেই।

(৫৭) বেকার পুরুষকে মেয়েরা ঘৃণা অথবা অনুকম্পার চক্ষে দেখেন।

(৫৮) অর্থ উপার্জনকারী অল্প শিক্ষিত স্বামী যদি মদ্যপও হন —মেয়েরা তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং বলেন "সাবাস"। কিন্তু অর্থ উপার্জনহীন উচ্চশিক্ষিত স্বামী যদি দৈনিক ভক্তিভরে তিলক্ষ সেবাও করেন—মেয়েরা তাঁকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং বলেন "বেচারা"।

(৫৯) কোন মেয়েই এক শাড়ী দু'দিন ব্যবহার করতে ভাল-বাসেন না। অথচ এক ধুতি অবাধে বহুদিন ব্যবহার করতে পারেন পুরুষ। সব মেয়েই বিচিত্ররূপিনী। বৈচিত্র বিলাসিনী।

(৬০) পুরুষের সঙ্গে কোন মেয়েই কামগন্ধহীন নিকষিত হেম সদৃশ বন্ধুত্ব বেশীদিন টিকিয়ে রাখতে পারেন না। বন্ধুর মুখে নিষ্কাম প্রেমের কবিতাও শুনতে ভালবাসেন না।

(৬১) স্বামীর গোপন কথাও মেয়েরা প্রিয়সখীকে না বলে পারেন না। কিন্তু প্রিয় সখীর গোপন কথা কখনও স্বামীকে বলেন না।

(৬২) সব মেয়েই সন্দিগ্ধপরায়ণা। তাই পুরুষের কাছে চির নবীনা হয়ে থাকার দুর্বার প্রচেষ্টা সব মেয়ের। তাই বহু প্রবীনাকেও নবীনার সাজে সজ্জিতা হয়ে থাকতে হয় অহোরাত্র।

(৬৩) সব মেয়েই পুরুষকে নিজের মনের মতো করে গড়ে পিটে তৈরী করে নিতে চান। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে মেয়েরা অতিবড় একরোখা ক্রুদ্ধস্বভাব দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী পুরুষকেও দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর মতো একান্ত নির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পারেন। এবং করেনও।

(৬৪) সব মেয়েই মোহিনীশক্তি সম্পন্না। সব মেয়েই জানেন পুরুষকে বশ করতে কি কি অস্ত্রের প্রয়োগ দরকার। এবং কখন কোন অবস্থায় সেসব অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়। কখন মান, অভিমান, চোখের জল, সাময়িক কর্মবিরতি, কৃত্রিম অসুস্থতা, দীর্ঘ সময়ের অসাক্ষাৎ এবং হঠাৎ নোটিশ না দিয়ে পিত্রালয়ে গমন—এইসব অমোঘ অস্ত্রগুলি প্রয়োগ করতে হয় এবং মোহিনী শক্তিকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলতে হয়।

(৬৫) সব মেয়েকেই এক কথায় বলা যেরে পারে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী। পণ্ডিতরা বলেন : পৃথিবীর সব বড় বড় অঘটনই নাকি নারীঘটিত।

(৬৬) সব দ্বিমুখী প্রতিভা সম্পন্না মেয়েরাই পরকীয় প্রেমে ভীষণ ওস্তাদ। স্বামীকে এবং প্রেমাস্পদকে একই সঙ্গে কিভাবে ম্যানেজ করতে হয়—পত্নীত্ব এবং প্রিয়াত্বকে কিভাবে একই সূত্রে গাঁথতে হয়—গরু এবং বাঘকে কিভাবে একই ঘাটে জল খাওয়াতে হয়—সতীত্ব এবং অসতীত্বকে কিভাবে একটিমাত্র কাঁচামিঠে আমেতে পরিণত করতে হয়—এই অভিনয়টুকু কোন দ্বিমুখী প্রতিভা সম্পন্নাকে বই পড়ে আয়ত্ব করতে হয় না।

(৬৭) সব মেয়েই নোংরামি অসভ্যতা বেলেল্লাপনায় চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে যেতে পারেন—যদি তাঁর রক্ষাকর্তা হন একজন জাঁদরেল পুরুষ। যাঁর কথায় দশজন ওঠেন বসেন। যাঁর কথাকে দশজন মনে করেন বেদবাক্য। যাঁকে দশজন অভিষিক্ত করেন নেতা বা হিরোর আসনে।

(৬৮) সব মেয়েই প্রেমের প্রথম পর্বে বলেন : "আমি তো চাই না—ওই তো আমাকে চায়।" সেই মেয়েই প্রেমের দ্বিতীয় পর্বে বলেন : "আমি মাঝে মাঝে চাই—কিন্তু ওই তো আমাকে সর্বক্ষণ চায়।" সেই মেয়েই আবার প্রেমের তৃতীয় পর্বে অর্থাৎ শেষ পর্বে বলেন : "আমরা দুজনেই দুজনকে চাই।" এইভাবেই প্রেম পর্বের মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়।

(৬৯) সব সন্তানবতী মেয়েরাই পুরুষের ওপর প্রভুত্ব করার লোভ ত্যাগ করতে পারেন না। এবং এটি একটি স্বতঃস্ফূর্ত নারীত্বের বিশেষ উপাদান। অবচেতন মনের গিন্নীপনার ভাব এই উপাদান থেকেই ক্রমশঃ বিকশিত হয়ে ওঠে। এবং বয়োক-নিষ্ঠাকেও এই গিন্নীপনার ভূমিকায় এতটুকু বেমানান বা বিসদৃশ লাগে না। বরং পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে তাঁর চলা বলা আচার আচরণ হিসেব নিকেশ ধমকানি শাসানি সব কিছু।

(৭০) অন্তসত্ত্বা অবস্থায় সব মেয়েদেরই অখাদ্য কুখাদ্য ভোজন যেমন বিশেষ সাধ ভক্ষণ। তেমনি কামনা বিহ্বল অবস্থায় অকথা কুকথা শোনাও পরম রতিসুখ আস্বাদন। এ ব্যাপারে প্রচলিত সভ্য ভব্য রীতিনীতি আচার আচরণ একেবারে অবান্তর। একেবারে নিরানন্দময়। একেবারে মূল্যহীন।

(৭১) যে স্বামীত্বে শুধু হুকুম আছে, বন্ধুত্ব নেই—সে স্বামীকে মেয়েরা সুযোগ পেলেই খড় কুটোর মতো দলে পিষে থেতলে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন অজানিতের পথে প্রকৃত বন্ধুর সন্ধানে।

(৭২) শুধু নীতি আদর্শ মতবাদ দিয়ে যে পুরুষ মেয়েদের মন টলাবার চেষ্টা করেন—তিনি মেয়েদের একটু তুষ্টুমিভরা

তাচ্ছিল্যের হাসি ছাড়া আর কিছুই পাওনার ঝুলিতে সঞ্চয় করতে পারেন না।

(৭৩) শুধু ভাবুকতা দিয়ে যে পুরুষ মেয়েদের মন ভোলাবার চেষ্টা করেন—তিনি মেয়েদের উপহাসের পাত্র মাত্র। এই প্রবণতাটি সমানভাবে ছোট মাঝারী বড়—সব মেয়েদের মধ্যেই বর্তমান।

(৭৪) শান্তশিষ্ট সভ্যভব্য অতিরিক্ত গোছালো গোবেচারী পুরুষেরা মেয়েদের চুচক্ষের বিষ। তবু তাঁদের ভাল লাগে এইজন্যে যে তাঁদের দিয়ে খুশিমত ফরমাস মাফিক কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। মৌখিক ধন্যবাদ দিয়ে অনেক অসাধ্য সাধনও করিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু মেয়েরা তাঁদের আন্তরিক ভালবাসেন না। প্রিয় সখীদের কাছে চুপি চুপি বলেন : ভীষণ ন্যাওটা। যখন যা আদেশ করি তাই শোনে। যখন উঠতে বলি ওঠে। যখন বসতে বলি বসে। যা খেতে দি খায়। ,যা পরতে দি পরে। ও হচ্ছে আমার পুষি ক্যাট। ও হচ্ছে আমার মিনমিনে মিনি।

(৭৫) অতিবড় ঘরছাড়া পুরুষকেও মেয়েরা ঘরমুখো করে তুলতে পারেন। এবং করেনও। এ ব্যাপারে সব মেয়ের প্রতিভাই সমান। কেন পুরুষ ঘরছাড়া হয়েছেন মেয়েরা শুধু একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেই বুঝতে পারেন।

(৭৬) বৈচিত্র পিপাসা তৃপ্ত না হলে সব মেয়েই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এবং এই অতৃপ্তি ক্রমশঃ ঘৃণার আকার ধারণ করে। স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে বানচাল করে দেয়। উঠতে বসতে শুনতে হয় : জীবনে সখ সাধ কিছুই মিটল না। কত নতুন নতুন শাড়ী উঠেছে, কত নতুন নতুন প্যাটার্নের গয়না উঠেছে—কিন্তু আমার পোড়া কপালে একটাও জুটল না। কাজের না আছে মাথা—না আছে মুণ্ডু। একটা কিছু কিনে দেবার মুরোদ যার নেই —সে আবার পুরুষ কিসের ? চললুম রূপময় দাদার সঙ্গে সিনেমায় রেস্তোরায় একজিবিসনে আর নিউ মার্কেটে।

(৭৭) বন্ধ্যা নারী ছাড়া সব মেয়েরই জীবনে বৈপ্লবিক রূপান্তর

ঘটে মাতৃত্বে। জীবনের একটা নতুন দিগন্ত খুলে যায়। অভূতপূর্ব সম্ভাবনার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে দুটি চোখ। গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনায় কেটে যায় সারা দিন সারা রাত। নিজের জীবনের অপূর্ণ সাধ সন্তান সন্ততির মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেতে চায়। ব্যক্তি সত্তাটা ক্রমশঃ হারিয়ে যেতে চায় সৃষ্টি সত্তার মধ্যে। নারীত্ব পূর্ণতা পায় মাতৃত্বে। মাতৃত্ব পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সন্তান সন্ততির মধ্য দিয়ে।

(৭৮) মাত্রাতিরিক্ত প্রগলভতা সব পুরুষের কাছেই বিরক্তিকর/ কিন্তু এটা কোন মেয়েই বোঝেন না। মনে করেন আন্তরিকতাহীন প্রগলভতা দিয়ে পুরুষকে আরো বেশী অনুরাগী করে তোলা যাবে। আরো কাছে টানা যাবে। আরো বেশী হ্যাংলা করা যাবে।

(৭৯) খুব কম মেয়েই এ কথাটা বলতে পারেন: আমি সাবালিকা। আমিই আমার অভিভাবিকা। আমার একটা নিজস্ব মত আর পথ আছে। আমার একটা নিজস্ব নীতি আর আদর্শ আছে। ফ্যাসন পালটানোর মতো সকালের নীতি বিকেলে পালটে যায় না। অথবা বিকেলের নীতি পরের দিন সকালে ওলট পালট হয়ে যায় না। নিজের আন্তর শক্তিতে আমি বলবতী। ধ্রুব তারার মতো লক্ষ্য আমার স্থির অচঞ্চল। আমি শক্তি স্বরূপিনী।

(৮০) মেয়েরা যাকে প্রকৃত ভালবাসেন তাঁর সামান্যতম অবহেলাও সহ্য করতে পারেন না। প্রতিদিন যে নিয়মনিষ্ঠা পালন করা হয়—তার সামান্যতম বিচ্যুতি মেয়েদের মনে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে। তখন একটা কথাই শুধু বারবার মনে হতে থাকে: ও বুঝি আর আমাকে চায় না। ওর বুঝি আর আমাকে ভাল লাগে না। ও বুঝি অন্য কারোর কাছে ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। ও বুঝি আর আমার নয়। ও আর আমি যেন আর এক নই। বিচ্ছিন্ন। স্বতন্ত্র। একলা। একলা।

(৮১) যে মেয়ে যত দুর্বল সে মেয়ে তত সবল পুরুষের

প্রেমাকাঙ্খিনী হতে চান। পক্ষান্তরে যে মেয়ে যত সবল সে মেয়ে তত তুর্বল পুরুষের অনুরাগিনী হতে চান।

(৮২) সব সুন্দরী মেয়েদেরই ধারণা পুরুষ সহজলোভ্য। তাই যে পুরুষ সহজলভ্য নন, তাঁকে পাবার জন্যে সব সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে হ্যাংলামী বেড়ে যায়। তাঁকে শুধু একবার দেখবার জন্যে, তাঁর মুখের একটু কথা শোনবার জন্যে, তাঁর পাশে এক মুহূর্ত বসবার জন্যে সব সুন্দরী মেয়েরাই অধীর আগ্রহে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করে থাকেন। কিন্তু মুখে একথা কোনদিন জীবনে সহজ স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করতে পারেন না। পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পারার জন্যে মুখে বলেন : তোমাকে আমার একটুও ভাল লাগে না।

(৮৩) সব মেয়েই পুরুষের কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে নারাজ। এটা যেন একটা কি ভয়ানক লজ্জাজনক ব্যাপার। তাঁরা মনে করেন—স্বেচ্ছায় ধরা দিলে নারীত্বের মূল্য হ্রাস পাবে, পুরুষের বেপরোয়া শক্তি বেড়ে যাবে। তাই পুরুষকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয়। কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। শাসনের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়। অধরাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে হয়। অধরা তখন ধরা দেয়।

(৮৪) আর্থিক সুখ স্বাচ্ছন্দ বাড়াবার কৌশল কোন মেয়েকেই শিখিয়ে দিতে হয় না। কাকে ধরলে কোন কাজটা উদ্ধার করা যাবে—কার মন জুগিয়ে কোন কাজটা কিভাবে হাসিল করে নিতে হবে—এটা ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা খুব ভালভাবে বোঝেন। তাই এই ধরণের মেয়েদের আর্থিক সুখ স্বাচ্ছন্দের অভাব কোনদিন হয় না। প্রচুর সম্পদশালিনী হতেও এসব মেয়েদের লাগে মাত্র কয়েকটা মাস। সারা জীবন ধৈর্য ধরে অপেক্ষাও করতে হয় না।

(৮৫) দেহ সর্বস্ব মেয়েরা আসলে মরেন মনে। যখন দেখেন মনের শূণ্য আসনে কেউ বসে নেই তখন সে শূণ্যতা দেহটাকেও অবশ করে দেয়। এবং আসল মানসিক মৃত্যু ঘটে তখনই।

তখনই বলা যেতে পারে : মেয়েটা মরেছে।

(৮৬) শুধু আধ্যাত্মিক ধর্মকে অবলম্বন করে কোন মেয়ে পৃথিবীতে বড় হতে পারেন নি। কিন্তু শুধু আধ্যাত্মিক ধর্মকে জীবনে পালন করে অনেক পুরুষ পৃথিবীতে বড় হয়েছেন। এদিক থেকে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা খুব বেশি প্রাকটিকাল।

(৮৭) মেয়েদের প্রতি উদাসীন ছেলেরা কোনদিন মেয়েদের শিকারে পরিণত হন না। তাই শিকারী মেয়েরা সব সময় অনুসন্ধান করেন শিকারী ছেলেদের। শেয়ানে শেয়ানে অবশেষে কোলাকুলিও হয়।

(৮৮) সব মেয়েই পুরুষদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। অবশ্য এই অবিশ্বাসের পনেরো আনাই অহেতুক। তবু এই অহেতুক অবিশ্বাস থেকেই কত সংসার জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কত উদার মন ক্ষুদ্রতা নীচতা আর কূপমুণ্ডুকতার পঙ্কিল আবর্তে চিরদিনের জন্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়। কত জীবন গতিহীন মুমূর্ষু হয়ে যায়।

(৮৯) সুদর্শনা মেয়েরা—ভগবান আছেন কি নেই—এ নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করেন না। তাঁরা জানেন তাঁদের একটু অনুরোধে শত শত পুরুষ ওঠেন বসেন, একটু মুখের হাসিতে লক্ষ লক্ষ স্তাবকের হৃদয়ে আগুন ধরে যায়, একটু সঙ্গদানে কোটি কোটি প্রেমিক বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। আর গুণমুগ্ধরা বলেন : সাক্ষাৎ ভগবতী। তাই সুদর্শনারা ভগবানকে ডাকেন না।

(৯০) শত নির্যাতন অপমান অপবাদ অনাহার দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যেও মেয়েরা ভুলতে পারেন না মনের মানুষটিকে। তাই মনেব মানুষটি কাছে এলে কথা বললে কিছু রঙ্গ রসিকতা করলে —মনে হয় জীবনের সব নেভানো আলোগুলো জ্বলে উঠলো—পৃথিবীটা যেন আরো সুন্দর সজীব প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো—জীবনটা যেন সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে নব জাগরণের গান গেয়ে উঠলো। যেন নতুন জন্ম হলো। নারীজন্ম সার্থক হলো।

(৯১) সব মেয়েরই এই কথাটা ভাবতে ভাল লাগে : ও শুধু আমাকেই ভালবাসে। ও শুধু আমাকেই সুখী করতে চায়। ও শুধু আমারই জন্যে দিনরাত এত পরিশ্রম করছে। ওর ব্যক্তিসত্তাটা যেন আজ আমারই মধ্যে ক্রমশঃ হারিয়ে যেতে চাইছে। ও যেন আমি হয়ে উঠতে চাইছে। ও যেন শুধু আমি আর আমি আর আমি।

(৯২) সব উপার্জনশীলা মেয়েরাই পুরুষের কর্তৃত্ব মানতে নারাজ। কর্তৃত্বের বদলে বন্ধুত্বের সমঝোতাই অধিক ভালবাসেন।

(৯৩) কামনার সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত নরনারী ভেদে ভিন্ন। পুরুষের ক্ষেত্রে এক মিনিটই যথেষ্ট। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ের প্রযোজন হয়। কামনায় মধ্যাহ্ন সূর্য যখন তার প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে মেয়েদের সকল অনুভূতিকে ভীষণভাবে উত্তপ্ত করে তখন প্রয়োজন হয় আসুরিক শক্তি সম্পন্ন পৌরুষের দাপট। যে পৌরুষ তার সমস্ত শক্তিকে প্রয়োগ করে ত্বরান্বিত করে আনবে শান্ত সুশীতল সুস্নিগ্ধ সূর্যাস্তকে।

(৯৪) পাপীয়সী মেয়েরাও পুণ্যবতী হয়ে ওঠেন যদি অপরিতৃপ্ত বাসনাটি পরিতৃপ্ত হয়।

(৯৫) সব প্রেমিকা মেয়েরাই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের অদ্ভুতভাবে মানিয়ে নিতে পারেন। অসন্তুটির কারণ থাকলেও বাইরে তা প্রকাশ করেন না। এমন কি নিজের পিতামাতার কাছেও প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে চান না।

(৯৬) সব মেয়েই শারীরিক রোগের চেয়ে মানসিক রোগেই বেশী ভোগেন। এবং শারীরিক রোগমুক্ত হয়ে উঠতে মেয়েদের বেশী সময় লাগে না। কিন্তু মানসিক রোগমুক্ত হতে সারা জীবনও অতিক্রান্ত হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাময়ও হয়ে ওঠেন না।

(৯৭) মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু মেয়েরাই। দুটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে—এটা স্বাভাবিক। কিন্তু

দুটি মেয়ে ও একটি ছেলের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে—এটা অস্বাভাবিক।

(৯৮) উপায়হীনা উপার্জনহীনা সব মেয়েরাই স্বামী সোহাগিনী হয়ে উঠতে বাধ্য হন। মনটা বিদ্রোহী হলেও।

(৯৯) সব মেয়েই জটিল মনের অধিকারিনী। তাই সরল-প্রাণা মহিলা কথাটা ভুল।

(১০০) সব মেয়েরই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ যৌন সম্ভোগে। আর মেয়েদের এই যৌন পুলকানন্দানুভূতি শুধুমাত্র জনন ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহের সূক্ষাতিসূক্ষ প্রতিটি অংশে বিধৃত। যার কেন্দ্রবিন্দু এক অতি ক্ষুদ্র অঙ্কুরে। যেখানে একটু অগ্নি সংযোগ করলেই দেহের প্রতিটি অঙ্গে ঘটে অপার্থিব সুখানুভূতির অলৌলিক বিস্ফোরণ। সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে থাকে। শিক্ষা অশিক্ষা সভ্যতা অসভ্যতা সুরুচি কুরুচি সংযম অসংযম মানবত্ব পশুত্ব সব একাকার হয়ে যায়। রোগ শোক ভয় ভাবনা দুঃখ দারিদ্র অভাব অনটন জরা মৃত্যু সব তালগোল পাকিয়ে যায়। শুধু আনন্দ, আনন্দ আর আনন্দ। শুধু সুখ, সুখ আর সুখ। শুধু ভাল লাগা, ভাল লাগা আর ভাল লাগা। আর সেই চরম পুলক-প্রাপ্তা রমণীর মুখখানি হয়ে ওঠে স্বর্গীয় দীপ্তিতে সমুজ্বল। মনে হয় ধন্য এই নারী জন্ম। মনে হয় সার্থক এই দেহধারণ। মনে হয় স্বর্গসুখ বলে যদি কিছু থাকে তবে এই যৌন সম্ভোগই। যার থেকে সৃষ্টি। যার থেকে আনন্দ। যার থেকে অমৃত। যার থেকে অমৃতস্য পুত্রার শুভাগমন এই মর্তলোকে। এই নিরানন্দময় পৃথিবীতে।

O একান্ন O

বর্তমান যুগের সবচেয়ে অনর্থকারী ছুটি শব্দ হচ্ছে—গরীব আর বড়লোক। মনুষ্যত্বের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে এই ছুটি শব্দ ভিন্নার্থক নয়—সমার্থক। তখন মনে হয় গরীব বড়লোকের লড়াইটা কত অসার, কত কৃত্রিম আর কত অশান্তি সৃষ্টিকারী। প্রতিনিয়তই আমরা দেখতে পাচ্ছি মনুষ্যত্বহীনতায় হৃদয়হীনতায় নোংরামী বাঁদরামী আর বেলেল্লাপনাতে এই দুই পক্ষই সমান ওস্তাদ। একেবারে হরিহর আত্মা। উভয়েই মিথ্যে কথা বলছে। অশ্লীল কথা বলছে। ঘুষ নিচ্ছে আর ঘুষ দিচ্ছে। চুরি করছে। খাদ্যে বিষ মেশাচ্ছে। অতিরিক্ত মুনাফার খাতা নকল করছে। ধূমপান করছে। মদ খাচ্ছে। বেশ্যালয়ে যাচ্ছে। মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছে। দল বেধে অসহায়কে আক্রমণ করছে। হানাহানি মারামারি কাটাকাটি করছে। চাকরীতে দাদন নিচ্ছে। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব তোষণ করছে। অনুপযুক্ত পার্টি ভ্রাতাকে প্রবেশাধিকার দিয়ে শিক্ষালয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখছে। অন্যায় ভাবে মামলা ঠুকে দিচ্ছে। গুণ্ডাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। গুণ্ডাকে পার্টির মেম্বার করে নিচ্ছে। মানুষকে ঘৃণা করছে। জীবনহানির ভয় দেখাচ্ছে। লাঠি সোটা ছুরি বোমা পিস্তল ছুঁড়ছে। রাজনৈতিক হত্যার নামাবলি গায়ে জড়িয়ে মানুষকে হত্যা করছে। অন্যায় করছে। অমানুষিক অত্যাচার করছে। বারোয়ারী পূজোর চাঁদার বই হাতে নিয়ে জুলুম করছে। ছাপোষা মানুষের উপরও হুকুম চালাচ্ছে। টেরিলিন প্যাণ্ট কোট পরিধান করে প্রোলেটেরিয়ট ধ্বনি আওড়াচ্ছে। বাঙাল তদ্বির করছে বাঙালের জন্যে। ঘটি তদ্বির করছে ঘটির জন্যে। এইভাবে সমাজবাদ পয়দা করছে। পৈতে টানছে পৈতেকে। অপৈতে টানছে অপৈতেকে। এইভাবে সাম্যবাদ পয়দা হচ্ছে।

আর এইসব গরীব বড়লোক নিয়েই গড়া হচ্ছে ডানপন্থী আর বামপন্থী রাজনৈতিক দল। যার যার স্বার্থ সব ঠিক আছে। সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পরমার্থের দিকে। অর্থ না হলে কিছু নয়। তাই যেন তেন প্রকারেণ অর্থ চাই। এই নিয়েই সৃষ্টি হচ্ছে দলাদলি। দল ছাড়াছাড়ি। অশান্তি। দাঙ্গা। হাঙ্গামা। মারামারি। কাটাকাটি। রক্তপাত। মুণ্ডপাত। গরীব কনেষ্টবল মরছেন। বড়লোক ডি সি মরছেন। আইন শৃংখলা ভেঙে পড়ছে। বিচারালয় প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। হাইকোর্টের জজ মরছেন। মফস্বলের এম ডি ও মরছেন। কালো মাটি রক্তে লাল হয়ে উঠছে। পুলিশ কুকুর আসছে। গরীবের শুকিয়ে যাওয়া রক্ত শুকছে। বড়লোকের শুকিয়ে যাওয়া রক্ত শুকছে। দৈবাৎ জিভে তাজা রক্ত ঠেকে যাচ্ছে। ঘেউ ঘেউ করে উঠছে। বলতে চাইছে : গরীব বড়লোকের রক্তের স্বাদ একই। লবণাক্ত।

০ বাহান্ন ০

কমিউনিজমের অস্তিত্ব ততদিনই যতদিন সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষ দরিদ্র, অশিক্ষিত, বেকার, অভুক্ত, গৃহহীন, পরিচ্ছদহীন আর রোগগ্রস্থ হয়ে থাকবে। তাই দারিদ্র, অশিক্ষা, বেকারত্ব, খাদ্যাভাব, গৃহহীনতা, পরিচ্ছদহীনতা আর রোগগ্রস্থতাই কমিউ-নিজমের প্রধান হাতিয়ার। তাই এই হাতিয়ারকে চিরকাল ধারাল রাখতে হলে দারিদ্র উপায়হীনতা উদ্ভুত সমস্যাগুলিকে কোনদিনই সমাধান করা চলে না। শত্রুমিত্রের যুদ্ধও চিরকাল চালিয়ে যেতে হয়। সমস্যার সমাধান হয়েছে অথচ কমিউনিজম আছে—এ হয় না। তেমনি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথচ কমিউ-নিজম আছে—এও হয় না। কিন্তু সমাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

অনুসরণ করে যে কোন বস্তুতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করে শান্তি আনা সম্ভব। এমনি একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—পৃথিবীব্যাপী বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ। পরিমিত জনসাধারণকে ধনী শিক্ষিত অর্থোপার্জনশীল, রাজকীয় খাদ্য, বাসস্থান আর পরিচ্ছদে স্বয়ংসম্পূর্ণ আর রোগমুক্ত করা সোনার পাথর বাটি সদৃশ আজগুবি কল্পনা-বিলাস নয়। একেবারে বাস্তব সত্যে পরিণত হতে পারে। তাই কমিউনিজম একটি সাময়িক ইজম। চিরকালের ইজম নয়।

চিরকালের ইজম সোসালিজম। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ।

O তিপান্ন O

মনুষ্যত্বকে বামপন্থী অথবা ডানপন্থী বলে—গরীব অথবা বড়লোক বলে—অপণ্ডিত অথবা পণ্ডিত বলে—ছোট জাত অথবা বড় জাত বলে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। গরীব, অপণ্ডিত, ছোটজাত, বামপন্থীরও মনুষ্যত্ব থাকতে পারে। তেমনি বড়লোক, পণ্ডিত, বড়জাত, ডানপন্থীও মনুষ্যত্বহীন হতে পারে। দয়া মায়া স্নেহ মমতা সেবা পরোপকার গরীবও প্রদর্শন করতে পারে—বড়লোকও প্রদর্শন করতে পারে। ঘৃণা বিদ্বেষ ঈর্ষা অপকার ডানপন্থীও করতে পারে—বামপন্থীও করতে পারে। চুরি রাহাজানি ছিনতাই ডাকাতি খুন ছোটজাতও করতে পারে—বড়জাতও করতে পারে। সমাজ-বিরোধী দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্রহীন অপণ্ডিতও হতে পারে—পণ্ডিতও হতে পারে। তাই মনুষ্যত্ব শ্রেণীহীন।

০ চুয়ান্ন ০

কমিউনিজমের অগ্রগতি চিরকালের জন্যে স্তব্ধ করে দিতে হলে—পৃথিবীতে অবাঞ্ছিত শিশুর জন্ম বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। দুইয়ের অধিক সন্তান কামনাকারী দম্পতিকে কঠোর হাতে শাস্তি দিতেই হবে। প্রয়োজনে মৃত্যুদণ্ডও।

০ পঞ্চান্ন ০

হিংসাকে বাদ দেবে কেমন করে?

পাওয়ারের খেলায় সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, অবিশ্বাস, অপমান, উপহাস, আক্রমণ। অহিংসা, ভালবাসা, বিশ্বাস, সম্মান প্রদর্শন, স্থিতাবস্থা—এসব হাতিয়ার পাওয়ারের খেলায় সম্পূর্ণ অচল।

হিংসাকে বাদ দেবে কেমন করে?

পৃথিবীর অর্ধেকেরও অধিক সুখাদ্য হিংসাকে ভিত্তি করেই সংগ্রহ করতে হয়। পশু পক্ষী মৎস কীট পতঙ্গ ভোজীরা নিরামিষ খাদ্যকে সুখাদ্য বলেন না। অহিংসাকে ভিত্তি করে তাবৎ খাদ্য সংগ্রহ করতে হলে পৃথিবীর সকল মানুষকে নিরামিষাষী হতে হবে। যেন কতকটা সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় হয়েছে আর পৃথিবীর সকল মানুষ নিরামিষাষী হয়ে গেছেন।

হিংসাকে বাদ দেবে কেমন করে?

সসস্ত্র হিংসা প্রধানের শ্লোগানই হচ্ছে : "শত্রুকে নিধন কর। যদি না পারো—তোমাকে পরাজয় বরণ করতেই হবে। তোমাকে পরাধীন থাকতেই হবে। তোমাকে হীনমন্যতা, দুঃখ, কষ্ট, মর্মযাতনা

সহ্য করতেই হবে।" নিরস্ত্র অহিংসা যুদ্ধ পৃথিবীর সব মানুষ গ্রহণ করবেন কিনা—এটা এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার।

হিংসাকে বাদ দেবে কেমন করে ?

হিংসা না থাকলে শোষণ করা যায় না। শোষণ না করলে কোটিপতি হওয়া যায় না। কোটিপতি না হলে সমাজের শিরোমণি হওয়া যায় না। সমাজের শিরোমণি না হলে ইচ্ছামত সমাজকে পরিচালনা করা যায় না। আর গণতান্ত্রিক সমাজবাদে এই শোষণের পরিমাণ অল্প। কিন্তু শোষণ হিংসারই রূপান্তর মাত্র।

তাই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী মানুষের জীবনে হিংসা অপরিহার্য।

০ ছাপান্ন ০

কিন্তু সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জীবনে হিংসা অপরিহার্য নয়।

হিংসাকে পরিহার করা যায় যদি পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। তখন পরিমিত খাদ্য, পরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদ আর পরিমিত ভূখণ্ড নিয়ে নিয়ত কাড়াকাড়ি মারামারি কাটাকাটির কোন প্রয়োজন হবে না অথবা সাম্রাজ্য বিস্তার করবার জন্যেও কোন অশুভ প্রচেষ্টায় মানুষকে নিয়ত মত্ত হয়ে থাকতে হবে না।

হিংসাকে পরিহার করা যায় যদি পৃথিবীর শক্তিশালী জাতি-গুলি যুদ্ধের মারণাস্ত্র সৃষ্টি বন্ধ করে।

হিংসাকে পরিহার করা যায় যদি পৃথিবীর সমগ্র জনগণ ইতর পশুপক্ষী মৎস কীট পতঙ্গাদি ভোজন ত্যাগ করে।

হিংসাকে পরিহার করা যায় যদি পৃথিবীর সকল মানুষ কাম

ক্রোধ লোভ মোহ মদ আর মাৎসর্যকে মানবিক বুদ্ধি বিবেচনা শিক্ষা সংস্কৃতি দিয়ে সংযত করতে শেখে।

হিংসাকে পরিহার করা যায় যদি পৃথিবীর সকল মানুষ গণতান্ত্রিক সমাজবাদে শিক্ষিত হয় এবং মানবিক অধিকার আইন শৃংখলা বিচার বিবেচনা মানে এবং পরমত সহিষ্ণু হয়।

০ সাতাশ ০

কমিউনিজমের অগ্রগতিকে চিরকালের জন্যে স্তব্ধ করে দিতে হলে—পৃথিবীতে বহু বিবাহের কুপ্রথা দূর করতেই হবে। ধর্ম, কৃষ্টি অথবা সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে যারা এই বর্বর প্রথাটিকে জিইয়ে রাখতে চায়—তাদের কঠোর হাতে শাস্তি দিতেই হবে। প্রয়োজনে মৃত্যুদণ্ডও।

০ আঠাশ ০

রাজনীতিতে শুধু ডানপন্থী ভুল করেন আর বামপন্থী ভুল করেন না—একথা যাঁরা বলেন তাঁরা ইংরেজী "টু আর ইজ্ হিউম্যান" প্রবাদ বাক্যটির মর্মার্থ আজো সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি।

রাজনীতিতে শুধু ডানপন্থী অন্যায় করেন আর বামপন্থী অন্যায় করেন না—একথা যাঁরা বলেন তাঁরা রাজনৈতিক উল্টাপুরাণের একটি পৃষ্ঠাও আজো খুলে দেখেন নি বুঝতে হবে।

রাজনীতিতে শুধু ডানপন্থী দুর্নীতিপরায়ণ হন আর বামপন্থী দুর্নীতিপরায়ণ হন না—একথা যাঁরা বলেন তাঁরা স্বয়ং ঈশ্বরের

বরপুত্র। তাঁরা জীবনে ষড়রিপুর দাস নন। তাঁরা কামিনীকে বলেন 'মায়া' আর কাঞ্চনকে বলেন 'মাটি'।

আমার মত : যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। কড়া নিরপেক্ষ সমালোচনা দরকার। বামপন্থী অথবা ডানপন্থী বলে কোন খাতির নয়। কঠোর নিরপেক্ষ শাস্তি দরকার। মনুষ্যত্বহীন কাজ যে করবে—সে ডানপন্থীও হোক অথবা বামপন্থীও হোক—তার রেহাই নেই। দুর্লভ মনুষ্য সমাজ থেকে তাকে বিতাড়িত করতেই হবে। সুষ্ঠু সমাজ ব্যাবস্থার জন্যে এই সমদর্শী ভাবধারার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এর সুফল এই—ডানপন্থী অথবা বামপন্থী কোন পন্থীই কোনদিন স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারবে না। মজুবুত সরকার গঠিত হবে। দেশের মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

০ উনষাট ০

পৃথিবীতে অবাঞ্ছিত শিশুর জন্ম রোধ কর। দেখবে সোসালিজমের পাত্র থেকে কমিউনিজম কর্পূরের মতো উবে গেছে।

০ ষাট ০

জনতা যেন নারী। নিত্য নতুন তার ফ্যাসন। নিত্য নতুন বায়নাক্কা। নিত্য নতুন শাড়ী বদলের সাধ। নিত্য নতুন অসন্তুষ্টি। নিত্য নতুন আকাঙ্খা। শুধু মেটেরিয়াল গেনের দিকেই শ্যেনদৃষ্টি। শুধু বহিরঙ্গ সজ্জায় সজাগ। হৃদয় পক্ষাঘাতগ্রস্থ। মস্তিস্ক অকসন্ন।

০ একষট্টি ০

হেমন্ত বসুর হত্যার পর "অজাতশত্রু" কথাটা কাউকে উচ্চারণ করতে শুনলেই আমি চমকে উঠি। ভাবি ওটা শুধু কথার কথা। আভিধানিক অর্থ থাকলেও—জীবনে ওর কোন অর্থ নেই। যদি থাকতো বিপক্ষ পার্টির লোকেরা হেমন্ত বসুকে হত্যা করতো না। আদর্শ আর মতবাদের অমিল থাকলেই মানুষকে হত্যা করতে হবে ?

ছোট একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। হত্যার মাস দুয়েক আগে একটি পনের ষোল বছরের ছেলে আমার কাছে এল। হাতে একটা চিঠি। চিঠির এক কোনে ইংরেজীতে "রেকমেণ্ডেড" লেখা। তার নীচে হেমন্ত বসুর সই। আমারও সই নাকি দরকার। সই করলাম। ছেলেটি বিপন্ন পরীক্ষার্থী। নিরাপত্তামূলক আইনে তাকে ধরা হয়েছে।

পরে শুনলাম পরীক্ষার্থীটি বিপক্ষ পার্টি'র ছেলে। সব জেনেশুনে হেমন্ত বসু সই করেছেন। আমিও করেছি। হত্যা নয়—জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে এই ধরণের অনেক সই নাকি তিনি জীবনে করেছেন। লোকে তাই বলত হেমন্ত বসু 'অজাতশত্রু'।

০ বাষট্টি ০

কমিউনিজমের অগ্রগতি চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দিতে হলে —শ্রেণী সংগ্রামকে বর্বর যুগের ক্রিয়াকলাপ বলে নিন্দা করতেই হবে। প্রশংসা করতে হবে শ্রেণী সমন্বয়ের আধুনিক সুসভ্য যুগের ক্রিয়াকলাপকে। আর শ্রেণী সংগ্রামের উপাসকদের কঠোর হাতে শাস্তি দিতে হবে। প্রয়োজনে মৃত্যুদণ্ডও।

০ তেষট্টি ০

আমারই লেখা নাটক অভিনীত হচ্ছিল "রংমহলে"। নাটকের প্রথম অংক প্রায় শেষ হয়ে আসছে। দ্বিতীয় অংকের জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের পিছন দিকের সেটে। তোড়জোড় শুরু হয়েছে গ্রীনরুমেও। পাত্র পাত্রীরা মেক-আপ নিয়ে ব্যস্ত। পরিচালকও ব্যস্তসমস্ত গলদঘর্ম। প্রমটাররা অনুচ্চ কণ্ঠে ধরিয়ে দিচ্ছে নাটকের সংলাপ। আলোক শিল্পীরা মায়াজাল সৃষ্টি করছেন পরিমিত সুনিয়ন্ত্রিত আলোক সম্পাতের মাধ্যমে। সংলাপ আর নাটকীয় মুহূর্তের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে নেপথ্য যন্ত্রসংগীত ধ্বনিত হচ্ছে লঘুগুরু ছন্দে।

হঠাৎ সব নিস্তব্ধ। শুধু অনুচ্চ কণ্ঠের সংলাপ। নায়ক নায়িকা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ষ্টেজের ওপর।

নায়িকা : শুধু শয্যা সঙ্গিনী হয়ে বেঁচে থাকার গৌরব থেকে তুমি আমাকে চিরদিনের জন্যে রেহাই দাও। শুধু কাজ কাজ আর কাজ। কাজই তোমার জীবন—তাই তোমার প্রয়োজন ঐ কর্মসঙ্গিনীটির। আমি জানি—ও পারবে তোমাকে আরো বেশী করে কাজের জগতে ডুবিয়ে রাখতে—আরো বেশী করে ঘর সংসার ভুলিয়ে দিতে—আরো বেশী করে আমাকে ভুলিয়ে দিতে।

নায়ক : তুমি ভুল বুঝছ মাধু।

নায়িকা : বলেছি তো—ভুল বোঝাবুঝির বহু উর্ধে আজ আমরা চলে গেছি। তাই আজ কুলবধুর এই মিথ্যে মর্যাদা নিয়ে সংসার সংসার খেলা খেলতে আর আমারও ভাল লাগছে না। আমারও কাজের জগৎ আজ আমাকে হাতছানি দিচ্ছে সুবীর।

নায়ক : তুমি মিথ্যে সন্দেহ করছ মাধু।

এরি ফাঁকে আমি দোতলায় উঠে একেবারে শেষ সারির

সীটগুলোর পাশে এসে দাঁড়ালাম। তখনও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি নায়ক নায়িকার সেই অনুচ্চ সংলাপ। নায়ক অধুনা বম্বে প্রবাসী ভারতবিখ্যাত বাঙালী সুদর্শন নট। নায়িকা সদ্য বম্বে প্রত্যাগতা প্রতিভাময়ী সুদর্শনা নটী। ভাবতে ভাল লাগছে ওরা দুজনে এই নাটকীয় মুহূর্তে যে সংলাপ উচ্চারণ করছে—সেটা আমারই লেখা। ভাবতে ভাল লাগছে যে চরিত্রে ওরা দুজনে অভিনয় করছে সেটা আমারই সৃষ্টি। কেমন যেন একটা অপার্থিব আনন্দ উৎকণ্ঠায় সমস্ত শরীরটা অবশ হয়ে গেল। একটু বসবার ইচ্ছে হল। কিন্তু একটা সীটও খালি নেই। সব ভর্তি। সেই প্রায় অন্ধকারে শুধু একবার দর্শকদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব বসে আছে।

আমি ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলাম। পরিচালকের মুখোমুখি হলাম।

শুনেছ?—বিষণ্ণ কণ্ঠ পরিচালকের।

কি?—আমার নিরুত্তাপ জিজ্ঞাসা। আনন্দ উৎকণ্ঠার সেই নেশার ঘোরটা তখনও সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে যায় নি। কিছু আবেশ তখনও মউ মউ করছে মনের শাখা প্রশাখায়।

পরিচালকের কণ্ঠস্বর তখনও নিস্তেজ: অনুরাধা অভিনয় করবে না।

আমি তখন অনেকটা ধাতস্থ হয়েছি। কণ্ঠস্বরের উত্তাপ অনেকটা ফিরে এসেছে: অপরাধ?

কিছু বুঝতে পারছি না। এদিকে প্রথম অংক প্রায় শেষ হয়ে এল। দ্বিতীয় অংকের প্রথমেই ওর অ্যাপিয়ারেন্স। কি যে করি।

আচ্ছা আমি দেখছি।—এই বলে সোজা এসে হাজির হলাম মেয়েদের ড্রইংরুমের কাছাকাছি। দেখা হল অনুরাধার সঙ্গে। ড্রইংরুমে একা চুপটি করে বসে আছে। মুখ চোখ অস্বাভাবিক। এক কৌটা রুজ পাউডারের ছোপও লাগেনি গালে কপালে ঘাড়ে গলার নীচে। শাড়ীও বদলায়নি। ব্লাউজও পালটায়নি।

কি ব্যাপার অনুরাধা ? এখনও মেক-আপ করনি ? নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে—পরের সিনে প্রথমেই তোমার এ্যাপিয়ারেন্স ? কি ব্যাপার বলতো ?—সম্পূর্ণ সহজ স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন করলাম ওকে।

আমি অভিনয় করব না। দয়া করে আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিন। আমি বাড়ী যাব। এখানে আর এক মুহূর্তও ভাল লাগছে না।—আমার দিকে না তাকিয়েই অনুরাধা জবাব দিল।

কি বলছো তুমি ?

ঠিকই বলছি।

আমার ক্ষতি করবে ?

আপনি আমার ক্ষতি করেন নি ?

অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে শুধু বললাম : ক্ষতি ? আমি তো জীবনে কোন মানুষের ক্ষতি করিনি।

আমার করেছেন।—এই প্রথম সে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলল।

কই মনে তো পড়ছে না।

মন বলে কিছু আছে আপনার ?

মন ছাড়া মানুষ হয় নাকি ?

এতদিন জানতাম হয় না। আজ জানলাল—হয়। আর সেই মনহীন মানুষটা শুধু বসে বসে নাটক লেখে আর খুশীমত মেয়েদের হত্যা করে।

আমি কয়েক মুহূর্ত নির্বাক নিস্পন্দ প্রাণহীন হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম না ঝড়টা কোন দিক থেকে উঠেছে। কখন উঠেছে। ওর চোখ দুটো ভিজে ভিজে। ফর্সা মুখটায় কে যেন গোলাপী আবীর ছড়িয়ে দিয়ে গেছে! কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম কুমকুমের মতো ফুটে উঠেছে। বড় ভাল লাগল সেই বিষণ্ণ সুন্দর প্রতিমাময়ী মুখখানি অনুরাধার।

একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বললাম : যদি অন্যায় কিছু হয়ে থাকে

—ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্লিজ মেক-আপটা সেরে ফেল। তোমারই উৎসাহে এ চরিত্রটা সৃষ্টি করেছিলাম। কত কাটাকুটি নিজের হাতে করলে তুমি। কিছুই মনে পড়ে না তোমার ?

একটু দূরে চেয়ারটা সরিয়ে নিল অনুরাধা। ধরা ধরা গলায় শুধু বলল : আর কিছুই মনে পড়ে না আমার। কেন এখানে বসে বসে আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করছেন। আপনার নায়িকা কেমন অভিনয় করছে—দেখতে যাবেন না ?

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলাম। শুধু বললাম : আমার নায়িকা ?

এত সুন্দর অবাক হতে পারেন আপনি। আপনি শুধু নাট্যকার নন—খুব বড় অভিনেতাও। আপনার ওপর আমার কত শ্রদ্ধা ছিল জানেন ? কিন্তু আজ সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এখন দেখছি আপনার মতো এমন নিষ্ঠুর মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর দু'জন জন্মগ্রহণ করেনি।

মিথ্যাবাদী ?

নয় ?

প্রমাণ ?

আমার কাছে আজ ষ্টেজ রিহার্সালের সময় রুমালটা চাইবার সময় কি বলেছিলেন ? রুমালটা আনতে ভুলে গেছি—দেবে তোমার রুমালটা ? দিলাম। কেন দিলাম জানি না। যদিও জানতাম এই মেয়েলি ছোট্ট রুমালটা আপনার কোন কাজেই লাগবে না। তবুও দিলাম। কেন দিয়েছিলাম বলুন তো ? নিশ্চয়ই সেটা আপনার নায়িকাকে উপহার দেবার জন্যে নয় ?

এবার কতকটা আন্দাজ করতে পারলাম ঝড়টা কখন কোন দিক থেকে উঠেছে। শুধুই শান্তনার সুরে বললাম : উপহার তো নয়। শুধু এই দৃশ্যে রুমালটা ব্যবহার করবে—তাই। এই দৃশ্যে একটা রুমালের প্রয়োজন ছিল—তাই।

সব মেয়েরই প্রয়োজন আপনি এইভাবে মেটান বুঝি ?

অভিনয় শেষ হয়ে যাক। ফিরিয়ে দিচ্ছি তোমার রুমাল।

এই একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি এতবড় একটা প্রচেষ্টাকে নষ্ট করে দিতে চাইলে অনুরাধা ?

উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ল অনুরাধা : আমি আপনার আর কোন কথা শুনতে চাই না। এক্ষুনি ফিরিয়ে দিন আমার রুমাল—এক্ষুনি—এক্ষুনি। এক্ষুণি আপনার নায়িকার হাত থেকে ছিনেয়ে নিয়ে আসুন আমার রুমাল। আপনাকে দেওয়া জিনিস ওর হাতে এভাবে আমাকে দেখতে হবে—এটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। প্লিজ আমার রুমাল ফিরিয়ে দিন। আর দয়া করে আমার একটু যাবার ব্যবস্থা করে দিন। আমার আর এক মুহূর্তও এখানে ভাল লাগছে না।

জীবনে এই প্রথম জানলাম মেয়েদের জেলাসি কি সাংঘাতিক ব্যাপার। মনে মনে শুধু বারবার আবৃত্তি করলাম—

"জেলাসি দ্যাই নেম্ ইজ ওম্যান।" "জেলাসি দ্যাই নেম্ ইজ ওম্যান।" "জেলাসি দ্যাই নেম্ ইজ ওম্যান।" "জেলাসি দ্যাই নেম্ ইজ ওম্যান।"

০ চৌষট্টি ০

ধ্বংস করবার জন্যে মানুষের প্রতিভার অপচয় করবার কোন দরকার নেই—জানোয়ারের প্রবৃত্তিই যথেষ্ট। মানুষের প্রতিভার যথাযথ সদ্ব্যয় সৃষ্টিতে, গঠনমূলক কাজে, সমুন্নতিতে আর উন্নয়নে।

০ পঁয়ষট্টি ০

কমিউনিজমের অগ্রগতি চিরকালের জন্যে স্তব্ধ করে দিতে হলে গরীব বড়লোকের কোঁদল মেটাতেই হবে। সৃষ্টি করতে হবে মধ্যবিত্তের সমাজ। যে সমাজে গরীবও থাকবে না—বড়লোকও থাকবে না। থাকবে শুধু মধ্যবিত্ত। আর যারা এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করবে—তাদের কঠোর হাতে শাস্তি দিতেই হবে। প্রয়োজনে মৃত্যুদণ্ডও।

০ ছেষট্টি ০

সেদিন এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটল জীবনে কবিতা লিখলাম পর পর দুটি কবিতা। লিখলাম :

(এক)

—পৈতে—

হে পৈতে—
তুমি মোরে শিখায়েছ অসাম্যের খেলা,
বিভেদ বিভ্রান্তি দলাদলি।
কানে কানে শুনায়েছ : 'তোমার মোড়লি
সকলেই নেবে মাথা পেতে।
বর্ণশ্রেষ্ঠ তুমি
অসবর্ণ শূদ্রের কুল পুরোহিত।

তুমি ধর্ম

তোমার শ্রীচরণ কমল যুগলে
নেমে আসে অপৈতের কত না প্রণাম।
হে পৈতে—
তুমি মোরে শিখায়েছ কতনা প্রভুত্ব বাহাদুরী
অসামাজিক কত আঁচরণ।
কত কু-প্রথা, কত কু-সংস্কার,
যার শুরু উপনয়ণে
যার শেষ অশৌচ পালনে।
হে পৈতে—
তুমি মোরে শিখায়েছ কত না চাতুরী,
কত ঘৃণা, কত ভণ্ডামী, কত কারচুপি;
যার শুরু অস্পৃশ্যতায়
যার শেষ পঙতি ভোজনে।
হে পৈতে—
তুমি মোরে শিখায়েছ কত কূটনীতি,
পৈতে বর্ণের কত অগ্রাধিকার, কত সাম্রাজ্য বিস্তার;
যার শুরু বেদ অধ্যয়নে
যার শেষ উপাধি কৌলিন্যে।
হে পৈতে—
তুমি মোরে শিখায়েছ দ্বৈত অভিনয়
ছুঁচ হয়ে প্রবেশিয়া ফাল হয়ে প্রস্থানের ইন্দ্রজাল
রক্ষকরূপী সাধুতা আর ভক্ষকরূপী শয়তানী;
যার শুরু যজন যাজন অধ্যাপন অধ্যাপনায়
যাগ যজ্ঞ শান্তি স্বস্ত্যয়নে
ক্ষমা ত্যাগ তিতিক্ষা কর্মসহিষ্ণুতায়,
যার শেষ শূদ্র অস্পৃশ্য অন্ন ভোজনে আপত্তি।

হে পৈতে—
তোমাকে ধারণ করে পেয়েছি শকতি,
নাম মাত্র মূল্যে কিনে পেয়েছি অমূল্য সম্পদ
প্রভাব প্রতিপত্তি কত না দাপট
মানুষের মাঝে থেকে দেবতার মান।
তাই
তোমাকে নমি বারংবার
বলি : 'যুগে যুগে যেন আমি পৈতেধারী হই।'

(দুই)

—তোমাকে আর তোমাকে—

তুমি সুদূরের নীল
ধ্যান-মগ্ন আকাশের মতো।
তুমি মাটির সবুজ
রোমাঞ্চিত তৃণের মতো।
তুমি অধরা—
তুমি ধরা।
তুমি মানস প্রতিমা
একটা ভাব একটা কল্পনা একটা অশরীরী ছায়া।
তুমি মানবী প্রতিমা
রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ আনন্দিত কায়া।
তুমি আমার কল্পনা সত্তার
একদিক।

তুমি আমার বাস্তব সত্তার
অন্যদিক।
আমার ভাললাগা আজ দ্বিখণ্ডিত
দ্বিধা বিজড়িত।
তাই ভালবাসি
নীল সবুজে মেশানো সীমা আর অসীমাকে
আমার পরিপূর্ণ সত্তাকে
তোমাকে আর তোমাকে।

o সাতষট্টি o

বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি মাইকেল। প্রথম বিপ্লবী কবি মধুসূদন। প্রথম প্রগতিশীল আধুনিক বাঙালী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বিদ্রোহ তাঁর প্রচলিত জীবন দর্শনের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ তাঁর প্রচলিত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ তাঁর কবিতার প্রচলিত ভাষার বিরুদ্ধে, অঙ্গিকের বিরুদ্ধে, ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে, ছন্দের বিরুদ্ধে, চরিত্র সৃষ্টির বিরুদ্ধে।

বাংলা সাহিত্যের এই যুগপ্রবর্তক প্রথম মহাকবির অমর সৃষ্টি 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য। মধুসূদনই বাংলার পাঠক পাঠিকাদের সর্বপ্রথম শোনালেন মহাসাগরের সংগীত। সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। সর্বপ্রথম প্রবর্তন করলেন চতুর্দশপদী। সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য সাহিত্যে ঘটালেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার শুভ সম্মেলন। সর্বপ্রথম দানবকে শিরোপা দিলেন মহানায়কের মহাবীর পৌরুষের।

মধুসূদনের মতো এমন সংঘাতময় কবি জীবন তৎকালীন বাংলা দেশে শুধু বিরল নয়—সম্পূর্ণ অভাবনীয়। বাঙালী সমাজের রক্ষণশীলতা কূপমণ্ডুকতা আর কুসংস্কারাচ্ছন্নতা পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত মার্জিত মধুসূদনের উদার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করল। যার ফলশ্রুতি—ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে মধুসূদন আর নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে পারলেন না। ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন। পাণিগ্রহণ করলেন হেনরিয়েটার। পড়লেন ইংরেজ কবি ওয়াট, মিল্টন, স্যরের লেখা। ইতালীয় কবি ভার্জিল, দান্তে, পেত্রার্কের লেখা। আর গ্রীক কবি হোমারের লেখা। বাংলা কাব্য সাহিত্যের শতাব্দীব্যাপী সুসুপ্তির অবসান হল। উন্মুক্ত হল স্বাধীন চিন্তাধারার পথ।

লিখলেন : 'বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে, লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে পর' যবে এ নিগড় কোমল চরণে—স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে, ছিল না কি ভাবধন, কহ, লো ললনে, মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে?

লিখলেন : 'একাকিনী শোকাকূলা অশোক কাননে কাঁদেন রাখব বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে নীরবে। দুরন্ত চেড়ি সীতারে ছাড়িয়া ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব কৌতুকে।'

লিখলেন : 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে, কহ "হে দেবি" অমৃতভাষিণি। কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি রাঘবারি? কি কৌশলে রাক্ষসভরসা ইন্দ্রজিত মেঘনাদে, অজেয় জগতে, উর্মিলা বিলাসী নাশি ইন্দ্রে নিশঙ্কিলা?'

অনন্যসাধারণ এই দুঃসাহসী মহারথীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আর অনুকরণীয় প্রতিভায় গড়ে উঠল এক বলিষ্ঠ পৌরুষ দৃঢ়তা আর গাম্ভীর্যের এক পূর্ণাঙ্গ ক্লাসিক বাংলা কাব্য ভাবরূপ। গড়ে উঠল

বিচিত্র রস আর ভাবাশ্রয়ী এক পূর্ণাঙ্গ ক্লাসিক বাংলা কাব্য ভাষারূপ।

লিখলেন বাংলা ভাষার প্রথম সনেট : 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি— পরধনে লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।...স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে—"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি, এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি? যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে।" মাতৃভাষার প্রতি এই ঔদাসীন্য মর্মজ্বালায় বিদগ্ধ অনুতপ্ত মধুসূদনকে এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করল।

লিখলেন : 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে। জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায় ফিরাব কেমনে? দিন দিন আয়ুহীন হীনবল দিন দিন তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায়।' অবিস্মরণীয় এই আত্মজিজ্ঞাসার সরল স্বীকারোক্তি বাংলা কাব্য সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে চিরদিন বিরাজ করবে। আর সাহিত্যানুরাগী সংস্কৃতাভিমানী বাঙালীকে একবার থমকে দাঁড়াতেই হবে বিদগ্ধ আত্মার স্মৃতি-বিজরিত সেই ফলকটির সামনে আর সকৃতজ্ঞ চিত্তে বারবার আবৃত্তি করতেই হবে—বাংলার প্রথম বিদ্রোহী বিপ্লবী কবির সেই অমর অমিত্রাক্ষর কাব্য-জীবনীর কয়েকটা পঙক্তি : "দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে, মহীর পরে মহানিদ্রাবৃত (জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম) দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন। যশোরে সাগরদাড়ি কপোতাক্ষী তীরে জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি রাজনারায়ণ জননী জাহ্নবী।"

০ আটষট্টি ০

শ্রেণী সংগ্রাম নয়—শ্রেণী সমন্বয়ই হচ্ছে ভারতের মর্মবাণী। শ্রেণী বিরোধিতা নয়—শ্রেণী সহায়তাই হচ্ছে ভারতের মুক্তির বাণী। শ্রেণী ঘৃণা নয়—শ্রেণী ভালবাসাই হচ্ছে ভারতের সভ্যতার বাণী। শ্রেণী হিংসা নয়—শ্রেণী অহিংসাই হচ্ছে ভারতের সংস্কৃতির বাণী।

০ উনসত্তর ০

বিজ্ঞানই সমগ্র পৃথিবীর জড় পদার্থকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সৃষ্টি হচ্ছে আবার ধ্বংসও হচ্ছে। ফুল ফুটছে আবার ঝরছেও। মানুষই ধ্বংসমুখী বিজ্ঞান বুদ্ধির সহায়তায় সমস্যার সৃষ্টি করছে, ভ্রান্তনীতির উদ্ভাবন করছে, পৃথিবীকে অসুন্দর করছে, জীবনকে কলুষিত করছে। আবার সেই মানুষই সৃষ্টিমুখী বিজ্ঞান বুদ্ধির সহায়তায় সমস্যার সমাধান করছে, মানব কল্যাণমূলক নীতির উদ্ভাবন করছে, পৃথিবী আর জীবনকে সুন্দর সুন্দরতর সুন্দরতম করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। চিরকালীন শান্তি সুখ সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু স্বপ্ন বারবার ভেঙে যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান অবাঞ্ছিত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনিতে। তাই এই সৃষ্টিমুখী বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ—জন্ম নিয়ন্ত্রণ করো। পৃথিবীতে একমাত্র বাঞ্ছিত শিশুর জন্ম হোক। পররাজ্য গ্রাস করার অশুভ বুদ্ধি, যুদ্ধায়োজনের প্রস্তুতি, মারণাস্ত্র সৃষ্টির প্রতিযোগিতা, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, পরশ্রীকাতরতা চিরদিনের জন্যে বিদূরিত হোক। পৃথিবীতে একান্ত বাঞ্ছিত যে কজন মানুষ বেঁচে থাকবে তারা যেন প্রকৃত মানুষের মতো হয়ে বেঁচে থাকে, তারা যেন অর্থাভাব অন্নাভাব গৃহাভাবে ক্লিষ্ট হয়ে,

শিক্ষাহীন স্বাস্থ্যহীন বস্ত্রহীন হয়ে বেঁচে না থাকে। তারা যেন জানোয়ারের মতো নিয়ম শৃংখলা আইন কানুন নীতি আদর্শহীন হয়ে মারামারি কাটাকাটি খুনোখুনি করে শুধুমাত্র অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা না করে। সমগ্র মানব সমাজের শুভবুদ্ধির কাছে এই আমার আন্তরিক প্রত্যাশা।

০ সত্তর ০

সর্ববিধ ভয় থেকেই আসে ক্লিবত্ব। ক্লিবত্ব থেকেই আসে জড়ত্ব। জড়ত্ব থেকেই আসে মৃত্যু।

০ একাত্তর ০

জড় পদার্থকে বাদ দিয়ে কোন কিছু আমরা কল্পনাই করতে পারি না। প্রেম দয়া মায়া ত্যাগ তিতিক্ষা স্নেহ মমতা সাধুতা মহত্ব সম্মান বিশ্বাস কামনা বাসনা মনুষ্যত্ব দেবত্ব—সবেরই মূলে এই জড় পদার্থ। তাই এই জড়পদার্থের উৎকর্ষ ও সমুন্নতিই মানব জীবনের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের একমাত্র সোপান। আর এই কল্যাণ সাধনার শ্রেষ্ঠ যন্ত্র সৃষ্টিমুখী বিজ্ঞান সাধনা। শ্রেষ্ঠ যন্ত্রী সীমিত সুশিক্ষিত পরিমার্জিত নরনারী।

০ বাহাত্তর ০

সেদিন শ্রাবণ সন্ধ্যায় অক্লান্ত বর্ষণের নূপুর নিক্কন শুনতে শুনতে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল কিছু আঁকবার জন্যে। শিল্পী নই—শুধু লিখিয়ে। তাই শুধু লেখা চিত্র একেই দুধের সাধ ঘোলে মেটালাম। সর্বহারা অথবা সবগ্রাসী বাঙালী পরিবারের চিত্র না এঁকে—আঁকলাম একটি বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্র।

কর্তা চাকরী করেন। মাসিক মাইনে পাঁচশো টাকা। নিজের হাতখরচা ও গাড়ীভাড়া বাবদ প্রতি মাসে লাগে ত্রিশ। তিনটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা উপার্জনহীনা। পড়াশুনা করে। প্রতিমাসে তাদের টিউশন ফি পঁয়ত্রিশ। হাত খরচ ও গাড়ীভাড়া ষাট। প্রায়ই ইউনিভার্সিটি, কলেজ আর স্কুলের ডিফল্টার লিষ্টে তাদের নাম ওঠে। ছেলে দুটি ছোট। স্কুলে পড়ে। উপার্জনহীন। টিউশন ফি বারো। হাত খরচ ও গাড়ীভাড়া ত্রিশ। পড়াশুনায় একটুও মন নেই। প্রায়ই ডিফলটার লিষ্টে নাম ওঠে। দিনরাত্রি গুলতানি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ। সিনেমা আর ফুটবল খেলার সমালোচনায় পড়বার সময়টাও নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিমাসেই ছেলেমেয়েদের একটা না একটা কেতাব কেনা চাইই। কমপক্ষে পাঁচ টাকা বরাদ্দ করতেই হয়। এদিকে পোষ্য বিধবা মা উপার্জন-হীনা। প্রায়ই অনুযোগ শুনতে হয়। কাপড় নেই। গামছা নেই। পান নেই। জর্দা নেই। নাতি নাতনির হাতে দেবার মতো পয়সা নেই। কর্তা চিন্তিত। মাসিক ত্রিশ টাকার ব্যবস্থা করে দিতেই হয়। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল হয় উপার্জনহীনা অর্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে। কর্তাকে দেখলেই তার অভিশপ্ত জীবনের করুণ কাহিনী বলা শুরু হয়। সঙ্গে কয়েক ফোঁটা চোখের জল। এমন পোড়া কপাল তার যে জীবনে সখ সাধ কিছুই মিটল না। আজ তিন মাস

হল একটা মাত্র ষাট টাকা দামের শাড়ীর কথা বলেছি। কিন্তু কর্তা এক কান দিয়ে শুনছে আর এক কান দিয়ে বার করে দিচ্ছে। লোকের বাড়ীর ঠিকে ঝির অবস্থাও তার চেয়ে অনেক ভাল। চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে। অগত্যা কর্তাকে গড়ে মাসিক কুড়িটি টাকার ব্যবস্থা করে রাখতেই হয়। তারপরই শুরু হয় অতর্কিত আক্রমণ। ছেলেরা মেয়েরা আর বিধবা মাও একযোগে দাবী পেশ করে, তাদেরও জামা কাপড় জুতো মোজা প্যাণ্ট সার্ট বাড়ন্ত। তাদের জন্যেও মাসিক ত্রিশ টাকার ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করতেই হয়।

এবার বাসস্থানের সমস্যা। মাসিক বাড়ীভাড়া বাবদ দেড়শ টাকার সংস্থান করে রাখতেই হয়। নইলে তাগাদার দাপটে জীবনের সামান্যতম মাধুর্যটুকুও লোপাট হবার উপক্রম। এ ছাড়া সাপ্তাহিক রেশনের মাসিক হিসেব দাঁড়ায় ষাট টাকায়। ইলেকট্রিক পনের। ধোপা পনের। কাঁচা বাজার একশ কুড়ি। তেল নুন ডাল মশলা কেরোসিন ঘুঁটে কাঠ কয়লার পাকা বাজার সত্তর। ওষুধ বিশ। খবরের কাগজ পাঁচ। দুধ ষাট। চা পাউরুটি বিস্কুট মাখন আটত্রিশ। ঠিকে ঝি পনের। খাওয়া পরা সমেত ছোকরা চাকর ত্রিশ। মাষ্টার মশাই আর টিউটোরিয়াল পঞ্চাশ। আতিথেয়তা আর লৌকিকতা বিশ। গৃহিনীর সত্য-নারায়ণের সেবা পূজা ফুল গঙ্গাজল পনের। টুকিটাকি দশ। রবিবারের মাংস অথবা ডিম অথবা পাকা পোনার কালিয়া এবং সন্দেশ অথবা রসগোল্লার মাসিক হিসেব চল্লিশ। টুথপেষ্ট, সাবান মাথায় দেবার ঠাণ্ডা তেল ষোল।

কর্তা হিসেবে বসেন। দেখেন খুব টেনে চললেও মাসিক খরচা ন'শো পঁচাশী টাকা। অর্থাৎ প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা ঘাটতি। মাথা গরম হয়ে যায়। শরীর অবশ হয়ে আসে। ধার চাইলে —শোধ দেবার সামর্থ থাকে না। আজকাল ধার কেউ দেয়ও না। অগত্যা অফিস ভরসা! ঘুষ মিথ্যাচার আর দুর্নীতির আশ্রয়

নিতে হয়। ছুটির দিনে ইনসিওরের দালালী করতে হয়। দেশে সামান্য জমি জমা আছে। তাও আবার পলিটিকাল বাবুদের বক্তিমার ঠেলায় বিশৃংখল অবস্থায়। কোন বছরে কিছু জোটে। কোন বছরে একেবারে ফক্কা। এদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। মধ্যবিত্তের একেবারে নাগালের বাইরে। হু হু করে ব্লাড প্রেসারও বেড়ে চলেছে। অর্থ সমতা রক্ষা করে প্রেসার নামিয়ে আনা মধ্যবিত্তের একেবারে নাগালের বাইরে।

কর্তা আর ভাবতে পারেন না। শেষ বেশ ভাগ্যের উপরই নির্ভর করেন। লটারী খেলেন। বড়লোক হবার জন্যে নয়। প্রাণঘাতী ধার দেনা মেটানোর জন্যে। কর্তার ভাগ্যে লটারীর সিকে ছেঁড়ে না। অগত্যা ফাঁকি চালাকি ফন্দি ফিকিরের আশ্রয় নিতেই হয়। বিশেষ সুবিধে হয় না। অনেক ফন্দিবাজ ধান্দাবাজ এ লাইনে বহুদিন থেকে ঘোরাফেরা করছে। তাদের অভিজ্ঞতার কাছে কর্তার অভিজ্ঞতা বারিবিন্দুসম। মুখ চুণ করে ফিরে আসতে হয়। রাজনৈতিক পার্টির সদস্য হবার মনস্থ করেন। কিন্তু মধ্যবিত্তের কোন দল নেই। অথচ সর্বহারার মতো দিবারাত্র পথে পথে ঘুরে—সময়ে অসময়ে "আমাদের দাবী মানতে হবে'র শ্লোগান আওড়াতে পারবেন না। কারণে অকারণে মিটিং অন্ত প্রাণ হলেও চলবে না। কথায় কথায় ধর্মঘট করে বাড়ীতে বসে থাকলেও চলবে না। যেন তেন প্রকারেণ মাসিক হাজার টাকার ব্যবস্থা করতেই হবে। কর্তার সংসার আছে। সমাজ আছে। দায়িত্ব আছে। কর্তব্য আথে। নির্ভরশীল প্রিয় পরিজন আছে। আবার সর্বগ্রাসীদের মতো লাখ পঞ্চাশ পুঁজি খেলিয়ে টেণ্ডার ধরাও চলবে না। অথবা সুদিনে বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল ষ্টক করে দুর্দিনে লাখ পঞ্চাশ হাজার বাজারে ছাড়াও চলবে না। অতএব—

কর্তা ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকবেনই বা কখন? অভাব অনটন

ধার কর্জের ভাগাড়ে মনটা সব সময় পড়ে আছে। তার থেকে মনটাকে মুক্ত করা সহজ কথা নয়। এসব মহাপুরুষের কর্ম। কর্তা মহাপুরুষ নন। সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারী মানুষ। অভাব অটটন ধার কর্জ বাধা বিপত্তি ক্লিষ্ট চঞ্চল মনটাকে নিয়ে ভগাবানকে ডাকলে তিনিই বা সাড়া দেবেন কেন? দৈবাৎ সাড়া দিলেও মানুষের দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগ দূর করবেন কেন? পৃথিবীতে তো এত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করলেন। ভগবানকে ডাকলেনও স্থির চিত্তে। পৃথিবীর মানুষগুলো কি সেই পুণ্যাত্মার প্রভাবে অভাব অনটন দুঃখ কষ্ট মুক্ত হয়েছে? পৃথিবী কি শুধু শিষ্ট ভদ্র মার্জিত শিক্ষিত মানুষের আবাসভূমি হয়েছে? দুষ্ট অভদ্র অমার্জিত অশিক্ষিত শয়তান মানুষগুলো তো আজও পৃথিবীতে অবাধে বুক ফুলিয়ে বিচরণ করছে। বেশ বহাল তবিয়তেই দুষ্ট চক্র গড়ে তুলছে। মানুষকে অমানুষ করছে। মানুষকে স্বার্থপর করছে। মানুষকে যুদ্ধবাজ করছে। মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে। মানুষকে অভাবের মুখে ঠেলে দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

তাই—

মানুষের সৃষ্ট দুর্নীতি দুষ্কর্ম মানুষকেই সংশোধন সংস্কার করতে হবে। আর সর্বহারাকে মধ্যবিত্তে উন্নীত করে আর সর্বগ্রাসীকে মধ্যবিত্তে নামিয়ে এনে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বদল ঘটাতে হবে। তবেই এই অপরিতৃপ্ত জীবন যন্ত্রণার অবসান হবে।

০ তিয়াত্তোর ০

যখন চোখের সামনেই দেখছে পাচ্ছি দুর্নীতিপরায়ণরা, অরাজকতা সৃষ্টিকারীরা, অসাধু ব্যবসায়ীরা, জোর জুলুমবাজরা, ঘুষখোররা, নীতি আদর্শহীনরা, অসৎ চরিত্রের নরনারীরা, অমার্জিত

অশিক্ষিতেরা, রাজনৈতিক খুনী আসামীরা জোটবদ্ধ হয়ে সমিতি গড়ছে, সভা করছে, দামী দামী জামা কাপড় পরছে, ভালমন্দ খাচ্ছে খাওয়াচ্ছে, বারোয়ারী পূজোয় মোটা চাঁদা দিচ্ছে, সভাপতি হচ্ছে, প্রধান অতিথির ভাষণ পড়ছে, বাড়ী তুলছে, গাড়ী কিনছে, ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে, শিক্ষিত লোকদের কর্মচারী হিসেবে পুষছে, মহল্লায় মহল্লায় মস্তানী করছে, ঘণ ঘণ ধূমপান করছে, বিলিতি কারণবারি পান করছে, সুন্দরী ললনাদের নিয়ে মধুচক্র গড়ছে, পুলিশের বড় বড় হোমরা চোমরা অফিসারদের হাত করছে, বারবণিতাদের মহল্লায় সারি সারি গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাস্তার শোভা বৃদ্ধি করছে, সিনেমা থিয়েটার জলসার সর্বোচ্চ আসনগুলি অগ্রিম বুক করে রাখছে, বন্যা মহামারী দুর্ভিক্ষে মোটা ডোনেশন দিচ্ছে, ঘরে বসে টেলিফোনে মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে মুস্কিল আসান করছে, প্লেনে চড়ে বিদেশ বিভূঁই ঘুরে আসছে, জীবনের সখ সাধ আনন্দ উৎসব চুটিয়ে উপভোগ করে নিচ্ছে—

তখন মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে : কেন আমি শান্ত শিষ্ট ভদ্র শিক্ষিত মার্জিত সদাচারী আদর্শবাদী ন্যায়পরায়ণ সত্যভাষী পরোপকারী হব আর দুঃখ দারিদ্র কষ্ট কৃচ্ছ্রতাকে বরণ করব আর ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করে পরের দরজায় হাত পেতে দাঁড়াব ?

তখন মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে : কে এই দুঃখ, দারিদ্র, আদর্শনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতার, সত্যভাষণের পরোপকারের যথার্থ মূল্য আর মর্যাদা দেবে ?

বরং আত্মীয়রা পথে দেখলে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। বলবে : ঐ ভিক্ষুকটা আমাদের কেউ নয়।

বন্ধুরা বলবে : একটা ইডিয়ট।

পাড়া পড়শীরা বলবে : একেবারে অপদার্থ।

স্ত্রী পুত্র কন্যারা বলবে : একটা আস্ত পাগল।

তখন মন স্বভাবতই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সুনীতিটাকে মনে

হয় আপদ। আদর্শবাদকে মনে হয়—বোকামী। চারিত্রিক শুচিতাকে মনে হয়—ছেলেমানুষী।

০ চুয়াত্তোর ০

অহিংসাসেবীর সবচেয়ে বড় বিপদ হিংসাসেবীর সসস্ত্র আক্রমণ। অহিংসাসেবীকে হয় হিংসার পথ অনুসরণ করতে হবে—না হয় মরতে হবে। "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" এই নামাবলী গায়ে জড়িয়ে হিংসাসেবীর হাতে আমি মরতে প্রস্তুত যদি পৃথিবী থেকে হিংসা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু তা হয় না। ইতিহাসের শিক্ষা : প্রাগৈতিহাসিক যুগেও হিংসার অস্তিত্ব ছিল—আজও আছে—ভবিষ্যতেও থাকবে। হিংসার মাধ্যমেই শক্তিশালী জাত পৃথিবীতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা কায়েম করেছে। থিওরী অব ফোর্স—থিওরি অব উইলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। তাহলে আমি আত্ম-রক্ষার জন্যে হিংসার পথ কেন বেছে নেব না? কেন দেশ রক্ষার জন্যে সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র মজুত করব না? আমার মত : নিজেকে আর দেশকে হিংসাত্মক আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে হলে প্রতিপক্ষের সমান মারণাস্ত্র মজুত করে রাখতেই হবে। অথবা কেউ মারণাস্ত্র মজুত করবে না—এমন একটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। পৃথিবীর একটিমাত্র দেশেও যদি মারণাস্ত্র সৃষ্টি করা হয়—আমাকে এবং আমার দেশকেও অনুরূপ মারণাস্ত্র সৃষ্টি করতেই হবে। মনুষ্যত্বকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাখার ঐ একটিমাত্র উপায়ই আমার জানা আছে। দ্বিতীয় কোন উপায় আমার জানা নেই। নিরস্ত্র জনগণকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে মুখে অহিংসার বুলি কপচানোর মতো জঘন্য কাজ আর কিছু হতে পারে না। একমাত্র মেরুদণ্ডহীন ক্লিব ভীরু

কাপুরুষের পক্ষেই এমন জঘন্য কাজ সমর্থন করা সম্ভব। প্রকৃত মানুষ বলবে : লড়াই করলে লড়াই করব—লড়াই থামালে লড়াই থামাব। জীবন নিলে জীবন নেব—জীবন বাঁচালে জীবন বাঁচাব।

পৃথিবীতে শান্তির সমতা একমাত্র এইভাবেই রক্ষিত হতে পারে।

O পঁচাত্তোর O

মানুষের মন আর ক্রিয়াকলাপ যত বেশী বিজ্ঞান নির্ভর হবে—জীবন আর পৃথিবীতে সমস্যা তত বেশী সমাধানের পথ খুঁজে পাবে।

যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য : একতা, প্রগতিশীলতা, একাগ্রতা, উচ্চতর কারিগরী বিদ্যা, দেশাত্মবোধ, নিয়মানুবর্তিকা, সমায়ানুবর্তিতা, আলস্য বিমুখতা, নতুন নতুন কল কারখানা সংস্থাপন, সকল সক্ষম স্ত্রীপুরুষের কর্মসংস্থান, সকল স্ত্রীপুরুষ জাতিধর্ম নির্বিশেষে, ভোটাধিকার, সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র প্রস্তুতকরণ, একান্নবর্তী পরিবারের উচ্ছেদ সাধন, দুটি প্রায় সম-রাজনৈতিক মতবাদ ভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান, বহু বিবাহের নিষিদ্ধকরণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি মননশীলতা আর ক্রিয়াকলাপ সমগ্র দেশ ও জাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন শক্তিশালী সুখী ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলে—

তেমনি অবৈজ্ঞানিক অসত্য : বিচ্ছিন্নতা, রক্ষণশীলতা, অস্থিরতা উচ্চতর অকারিগরী শিক্ষা, শুধুমাত্র আন্তর্জাতিকতাবোধ, অনিয়মানুবর্তিতা, অসময়ানুবর্তিতা, আলস্যপরায়ণতা, শুধুমাত্র পুরোনো কল কারখানার উপর নির্ভরতা, কর্মক্ষম মানুষের কর্মহীনতা, নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকার, মারণাস্ত্র প্রস্তুত নিষিদ্ধকরণ,

একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিপালন। বহু অসম রাজনৈতিক মতবাদ ভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থান, বহু বিবাহের উৎসাহ প্রদান, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতাকরণ প্রভৃতি মানসিকতা ও ক্রিয়াকলাপ সমগ্র দেশ ও জাতিকে দুরপনীয় দুঃখ দারিদ্র দুর্বলতার পথে, পরাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সমস্যা হয় আরো ঘনীভূত, জীবন হয় আরো যন্ত্রণাজর্জর, পৃথিবী হয় আরো অসুন্দর।

০ ছিয়াত্তোর ০

জীবনটা যেন একটা চলন্ত ট্রেন গাড়ী। কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু হয়। থামে এসে দিল্লীতে। মাঝে অসংখ্য ষ্টেশন। অসংখ্য যাত্রী। আলাপ পরিচয়। হৃদ্যতা। মন কষাকষি। কথা কাটাকাটি। পরনিন্দা। পরচর্চা। নবজাতকের আনন্দ বার্তা। আপন জনের বিয়োগ ব্যথার করুণ স্মৃতিকথা। স্মৃতিটুকু থাকে। স্মৃতিটুকু মুছে যায়। আবার শুরু হয় দিল্লী থেকে যাত্রা। কলকাতায় এসে থামে। আবার ট্রেন কখন ছাড়বে—ব্যাকুল প্রত্যাশায় যাত্রীরা ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাতে থাকে। হুইসেল বাজে। পতাকা ওড়ে। ধীরে ধীরে ট্রেন প্লাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে চলে। হাত নেড়ে এদিকে আর ওদিকে জানায় বিদায় অভিনন্দন। কারো চোখে এক ফোঁটা জল। কারো মুখখানি হাসির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। ক্রমশঃ দৃষ্টির বাইরে চলে যায় চলন্ত ট্রেনটা। একটু—আর একটু—আর দেখা যায় না।

স্মৃতিটুকু থাকে।

স্মৃতিটুকু মুছে যায়।

O সাতাত্তোর O

পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যৌন-কবি কে—বলতে পারব না। তবে আমার মতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যৌন-কবিতা কোনটি—একথা জিজ্ঞেস করলে এক নিঃশ্বাসে বলব—জয়দেবের 'রতি সুখ সারে গতমভি সারে মদন মোহন বেশম্।' যৌনতার কাব্যিক রূপ কবি জয়দেবের মতো এমন হৃদয়গ্রাহী রসগ্রাহী করে আর কোন কবি আঁকতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই।

O আঠাত্তোর O

নারী যখন ভ্রষ্টা হয় তখন তার স্রষ্টাও তাকে সংযত করতে পারেন না। স্রষ্টা অর্থে পিতামাতা এবং স্বয়ং ঈশ্বরের কথাই বলছি। এই ভ্রষ্টা নারীর রূপ কতকটা বিক্ষুব্ধ হিতাহিত আর দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য বন্যার মতো। খড় কুটো থেকে কত রাঘব বোয়াল যে এই বন্যারূপী ভ্রষ্টা নারীর কবলে পড়ে মরে, হাবুডুবু খায়—তার সঠিক বর্ণনা করতে গেলে গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে যায়। আমি এক ভ্রষ্টা নারীর অঙ্গ স্পর্শ করে দেখেছি। বয়লারের উত্তাপ তার কাছে কিছু নয়।

০ উনআশী ০

কোন কোন অল্প শিক্ষিত উগ্রপন্থী সর্বহারা মতবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতার মুখে প্রায়ই শুনি : উচ্চশিক্ষিত মধ্যপন্থী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরা নিপাত যাক।

মনে মনে বলি : ঐ উন্মাদ উগ্রপন্থী বুদ্ধিহীন নেতাটিই নিপাত যাক। অথবা সরকারী খরচে কোন প্রথম শ্রেণীর মানসিক হাসপাতালে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হোক। এবং সেখানে প্রথমেই তার মস্তিস্কের অসুস্থতা সম্পর্কে দৃঢ় নিশ্চয় হবার জন্যে পরীক্ষা করা হোক এই প্রশ্ন দিয়ে :

বুদ্ধিজীবিরা নিপাত যাক—এই শ্লোগানটা আপনি পেলেন কোথা থেকে? আকাশ থেকে? মাটি থেকে? বায়ু থেকে? না জল থেকে?

যদি উত্তর হয় : আজ্ঞে না। এ শ্লোগানটা আমি আকাশ মাটি বায়ু বা জল থেকে পাইনি। পেয়েছি জনৈক বিশ্ববিখ্যাত উচ্চশিক্ষিত মধ্যপন্থী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবি লিখিত অমুক কেতাব থেকে।

অনুমান মানসিক হাসপাতালের ডিরেক্টার সঙ্গে সঙ্গে সেই সেয়ানা পাগলটিকে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন।

কিন্তু আমি ডিরেকটার হলে এইসব রাজনৈতিক সেয়ানা পাগলদের জন্যে পৃথক একটি এয়ার কণ্ডিসন্‌ড সুসজ্জিত আরামদায়ক সর্বাধুনিক ঘরের ব্যবস্থা করতাম এবং সরকারকে অনুরোধ করতাম সুস্থ স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে এইসব রাজনৈতিক সেয়ানা পাগলদের অপপ্রচারের হাত থেকে বাঁচাবার স্বার্থে মোটা টাকার মাসোহারা দেওয়া হোক এবং যাবজ্জীবন সৌখীন

মানসিক রোগীর মর্যাদা দেওয়া হোক। এতে দেশ ও দশের মূল্যবান সম্পত্তি ও জীবন নির্বিঘ্ন হবে—প্রকৃত জনকল্যান হবে।

০ আশী ০

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আজ ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চের ভাঙা আসরের দৈন্যদশা দেখে বারবার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে তাঁর আসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর অনন্য সাধারণ কর্মকুশলতার কথা। বাংলা দেশের যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর কালজয়ী কীর্তি স্তম্ভগুলি চোখে পড়ছে। অবাক বিস্ময়ে সেগুলির দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি : একটা জাতকে আধুনিক প্রগতিশীল সর্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ে তোলবার জন্য ডাঃ রায়ের মতো আর কি কেউ স্বপ্ন দেখবেন না? সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়নের জন্যে কেউ কি ডাঃ রায়ের মতো একনিষ্ঠ দুর্জয় সাধানায় নিমগ্ন হবেন না? শুধু ভোটাভুটি শুধু আসন ভাগাভাগি শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের হানাহানিতে একটা প্রাণবন্ত জাতির জীবনীশক্তি দেউলিয়া হয়ে যাবে? এই তো সেদিন বাংলা দেশকে মডেল করে আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে যে পরিকল্পনাগুলি তিনি বাস্তবে রূপায়ণ করলেন—তা সবই আমরা চোখের সামনেই দেখছি। চোখের সামনেই দেখছি এদেশে প্রথম আমদানী করা ডানলোপিলো ফিট করা সুদৃশ্য আরামপ্রদ বাঙালী ড্রাইভার চালিত ডবল ডেকার বাসগুলি, দুর্গাপুরের ষ্টীল প্ল্যান্টে সহস্র সহস্র কর্মীর কর্মসংস্থান। সর্বপ্রথম প্রবর্তিত বোতলজাত দুগ্ধ মাখন ঘি। আর সর্বপ্রথম মহিলা কর্মী চালিত দুগ্ধ বিক্রয় কেন্দ্রগুলি। সর্বপ্রথম সরকারী উদ্যোগে চলচিত্র নির্মাণ। সর্বপ্রথম দীঘার সমুদ্র সৈকতে স্বাস্থ্য-নিবাস। সর্বপ্রথম সরকারী উদ্যোগে কল্যাণী উপনগরী পত্তন।

সর্বপ্রথম সুউচ্চ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং নির্মাণ। সর্বপ্রথম সরকারী উদ্যোগে পোলট্রি স্থাপন। সর্বপ্রথম সরকারী উদ্যোগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাসাদোপম গবেষণাগার উদ্বোধন। সর্বপ্রথম দূর পাল্লার ভ্রমনোপযোগী বিলাস বহুল সরকারী বাস—বাঙালী ড্রাইভার চালিত ট্যাক্সি পরিচালন। পোলিও ক্লিনিক স্থাপন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পুনর্গঠন। অরও কত সুপরিকল্পিত প্রয়াসের বাস্তব রূপায়ণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

ধর্মে ব্রাহ্ম আর কর্মে ক্ষত্রিয় এই কর্মবীর বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসকটি যে কথাটি ভারতবাসীকে শোনাতে চেয়েছিলেন—তার সারমর্ম : ভারতবাসীকে আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতগুলির সম শ্রেণীতে উন্নীত হতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণ, সুষম পুষ্টিকর খাদ্য, আধুনিক বাসস্থান, বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন, প্রাণশক্তিকে অটুট রাখতে আমোদ প্রমোদ, খেলাধুলা, ভ্রমণ ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পিত আয়োজন, উচ্চতম কারিগরী ও পুঁথিগত শিক্ষা, সমাজের সর্বস্তরের দ্রুত কর্ম সংস্থান, শিক্ষা, ব্যবসা, বানিজ্যের অবাধ সম্প্রসারণ, রোগ নিরাময়ের জন্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত চিকিৎসাকেন্দ্র। আমি বাঙালীকে নিয়ে কাজ শুরু করছি—এটা প্রাদেশিকতা নয়। এটা একটা সুমহান জাতির কৃষ্টি সভ্যতা শিক্ষা সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য ঐতিহ্য মনীষা আর কর্মক্ষমতার প্রতি একনিষ্ঠ এক সেবকের আনুগত্য মাত্র। জাতিকে বাদ দিয়ে—মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে—বৃহত্তর দেশের কথা ভাবা যায় নাকি? দেশকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষকে ভাবা যায় নাকি? স্বাতন্ত্রমণ্ডিত দেশগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তো সমগ্র ভারতবর্ষকে পরিচালিত করবে। প্রত্যেকটি দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আর্থিক প্রগতিই ভারতের প্রগতি। তাই আমি প্রথমে বাঙালী। তারপর ভারতবাসী। তারপর বিশ্ববাসী।

০ একাশী ০

কমিউনিজমের যে সব ত্রুটিগুলি ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদীকে অহরহ বিচলিত বিক্ষুব্ধ বিভ্রান্ত করে—আমি সেই শত শত ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মাত্র দশটি ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ করছি :—

(১) কমিউনিষ্টদের সানাইয়ের সঙ্গে এক সুরে পোঁ ধরতে না পারলে অভিযুক্ত হতে হবে। সারাজীবন চিহ্নিত হয়ে থাকতে হবে "বিশ্বাসঘাতক", "সুবিধাবাদী" বা "দালাল" বলে।

(২) কমিউনিষ্টরা বুদ্ধির স্বাধীনতা স্বীকার করেন না। নির্বোধ জনগণই কমিউনিজমের শক্তির উৎস।

(৩) কমিউনিজম বা কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে সন্দেহের অধিকার বা ভুলের সম্ভাবনা স্বীকার করে নেওয়া যায় না। তাই সন্দেহ ও বিরূপ সমালোচনা দণ্ডনীয় অপরাধ।

(৪) সাহিত্য শিল্পকলা, দর্শন, ধর্ম, সমাজ এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার কমিউনিষ্টরা স্বীকার করেন না। রাষ্ট্রের মতই একমাত্র মত। সেই মতেরই প্রচারক বুদ্ধিজীবি শ্রেণী। তাই ভিন্নমত পোষণ করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ।

(৫) কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের অভিধানে প্রতিবিপ্লব বলে কোন শব্দ নেই।

(৬) কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছু নেই--কিন্তু ব্যাক্তি পূজা উপলক্ষ্যে মহোৎসব আছে। দেবালয়ের মতো—নিহত কমরেডদের সমাধি-মন্দির আছে। প্রতিদিন সেখানে এসে অগণিত দরিদ্র কৃষক মজদুরকে মন্দির দর্শন করে যেতে হয়।

(৭) কমিউনিষ্ট পার্টি সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টিকে অবলুপ্ত করে দিতে চায়। উদ্দেশ্য—শাসন পরিষদে কোন রাজনৈতিক বিতর্কের সম্ভাবনা থাকবে না। এবং নীতি নির্ধারক সভায় কোন

মতবৈষম্য হলেই নিজেদের প্যার্টি'রই সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ বিনষ্ট করেই তার সমাধান করতে হয়।

(৮) শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর বহু বিঘোষিত অধিকার কমিউনিষ্ট মাতব্বরের দয়ার উপরই নির্ভরশীল। শ্রমজীবিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে যদিও পৃথক সংস্থা থাকে তবুও মাতব্বরের মর্জিই সব। সর্বহারাবাদী রাষ্ট্রে এই অসহনীয় অবস্থাটা ধনবাদী রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের অসহনীয় অবস্থা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।

(৯) সময় সময় কমিউনিষ্ট ও প্রাক কমিউনিষ্টদের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য সংখ্যালঘু প্রাক-কমিউনিষ্টদের প্রভাব দেশ থেকে একেবারে বরবাদ করে দেওয়া।

(১০) কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে জীবন মৃত্যু ভালবাসা ভাল মন্দ সত্য অসত্য—সব কিছুরই প্রচলিত অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। নিরস্ত্র মানুষকে ভয়ে সেই পরিবর্তিত অর্থই মেনে নিতে হয়—অন্তরে সাড়া না পেলেও।

০ বিরাশী ০

এই বোধটা তোমার মধ্যে জাগিয়ে তোল—"আমি ভারতীয় —এই আমার প্রথম পরিচয়।"

"আমি ভারতীয়—এই আমার শেষ পরিচয়।"

এই সংকল্পটা তোমার মধ্যে সুদৃঢ় কর—"আমার সর্বশক্তি দিয়ে ভারতকে আমি শিক্ষায়, মানবধর্মে, কৃষ্টিতে, সভ্যতায়, শৌর্যে, বীর্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশগুলির সমকক্ষ করে গড়ে তুলতে সাহায্য করব। ভারতবাসী বলে পরিচয় দিতে গর্বে আমার বুক ফুলে

উঠবে। ভারতের যেটা মন্দ সেটার সংশোধন করব প্রগতিশীল উদার মনোভাব নিয়ে। ভারতের যেটা ভাল সেটা বলিষ্ঠ দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করব পৃথিবীর সর্বত্র। প্রবীনের অনেক রক্ষণশীলতা আমাকে ত্যাগ করতে হবে। আর নবীনের অনেক উদারতা আমাকে গ্রহণ করতে হবে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে সংসার সমাজ আর রাষ্ট্র প্রবাহের চির গতিশীলতার দিকে। ক্ষুদ্র স্বার্থে তা যেন কোনদিন গতিহীন পঙ্কিল না হয়ে পড়ে।

আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি বৌদ্ধ, আমি জৈন, আমি পার্শী, আমি খৃষ্টান—আমি বাঙালী, আমি আসামী, আমি পাঞ্জাবী, আমি উড়িয়া, আমি বিহারী, আমি গুজরাটী, আমি মাদ্রাজী, আমি আদিবাসী, আমি হরিজন—আমি ভারতীয়। আমারই মধ্যে প্রবাহিত কত ক্ষুদ্র বৃহৎ নদী উপনদী শাখানদী সাগর মহাসাগর। সব এসে মিশে যাক ভারত মহাসাগরে। হারিয়ে যাক হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, আদিবাসী ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাদেশিকতা। অভ্যুদয় হোক নতুন চেতনাসম্পন্ন এক সুমহান অধিবাসীর—যার নাম শুধু ভারতবাসী।

তাই এই নব চেতনার বাণীটা দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও—

"আমি ভারতীয় ওরফে হিন্দু।"

"আমি ভারতীয় ওরফে মুসলমান।"

"আমি ভারতীয় ওরফে পার্শী।"

"আমি ভারতীয় ওরফে খৃষ্টান।"

"আমি ভারতীয় ওরফে বাঙালী।"

"আমি ভারতীয় ওরফে মাদ্রাজী।"

ইত্যাদি—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

তাই এই প্রতিজ্ঞাটা জোরদার করো: 'আমি ভারতীয় হয়ে ভারতবাসীকে কষ্ট দেব না—(তা সে যে কোন ধর্মেই বিশ্বাসী হোক না কেন।)'

'আমি ভারতীয় হয়ে ভারতবাসীর বুকে ছুরি বসাব না। (একমাত্র হিংসাত্মক রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছাড়া যে কোন দলভুক্তই সে হোক না কেন।)'

'আমি ভারতীয় হয়ে ভারতবাসীকে দারিদ্রের যন্ত্রণা সহ্য করতে দেব না—(তা সে যত সংখ্যালঘু দলভুক্তই হোক না কেন।)'

'আমি ভারতীয় হয়ে যে কোন ভারতবাসীর ব্যক্তিগত মাসিক আয়ের সীমা পাঁচ হাজারের উর্ধে উঠতে দেব না। (তা সে যে কোন রাজা মহারাজার বংশধর, শিল্পপতি বা গুণবানই হোক না কেন।)'

'আমি ভারতীয় হয়ে ভারতবাসীকে কর্মহীন বেকার করে রাখব না। (তা সে যত বিকলাঙ্গ অপটুই হোক না কেন।)

'আমি ভারতীয় হয়ে ভারতবাসীকে অভুক্ত, অশিক্ষিত, গৃহহীন, চিকিৎসাহীন করে রাখব না। (তা সে যত সামর্থহীনই হোক না কেন।)'

আমি ভারতীয় হয়ে জ্ঞানী গুণী শিল্পী সাহিত্যিক বিজ্ঞানবিদ গবেষক ভারতবাসীকে অর্থাভাবে আত্মহত্যা অথবা বিদেশে পলায়ন করতে দেব না। (তা সে যত খ্যাতিহীনই হোক না কেন।)'

তাই বল :

"আমি ভারতীয়—এই আমার প্রথম পরিচয়।"

"আমি ভারতীয়—এই আমার শেষ পরিচয়।"

O তিরাশী O

ইতিহাস বলছে : মার্কসীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তগুলি সুদৃঢ় বিচার বুদ্ধি যুক্তি বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

এই অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভা সম্পন্ন পণ্ডিতের বহু সিদ্ধান্ত কালক্রমে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন—

(১) সোসালিজমের বড় শরিক লক্ষ লক্ষ কৃষক। কিন্তু মার্কস ইউরোপের লক্ষ লক্ষ কৃষকের বাস্তব অবস্থার প্রতি একটুও দৃষ্টিপাত করেন নি। একটুও গুরুত্ব দেন নি। তিনি মনে করতেন বিপ্লব আন্দোলনের ক্রমবিকাশের পথে কৃষক আন্দোলন অপরিহার্য নয়। একমাত্র শহরাঞ্চলের শোষিত সর্বহারা শ্রমজীবিরাই বিপ্লব আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করবে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে—এটা ভুল।

(২) পৃথিবীর বহু সভ্য ভদ্র উন্নতিশীল শিল্পোন্নত ধনবাদী রাষ্ট্রে মার্কস বিঘোষিত 'শ্রেণী সংগ্রাম' অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হয়নি। ইতিহাস প্রমাণ করেছে—শত বৎসরেও যে সিদ্ধান্তের সার্বিক প্রয়োগ সম্ভব নয়—তাকে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলা যায় না।

(৩) নিষ্ঠুর সংগ্রাম বা বিপ্লব আন্দোলন ছাড়াই পৃথিবীর বহু শিল্পোন্নত ধনবাদী দেশে শোষিত সর্বহারা শ্রমজীবিরা সর্ববিধ অর্থনৈতিক ন্যায়পরায়ণতা, অধিকতর মজুরী, চাকুরীর অবস্থার প্রভূত উন্নতি, নিজস্ব সংগঠন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। এবং মালিকদের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ আলোচনা, আইন মাফিক চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক সাম্য বজায় রাখতে পেরেছেন—এমন দৃষ্টান্ত বহু রাষ্ট্রে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাস বলছে : মার্কস বিঘোষিত শ্রমিক মলিক একদিন নিষ্ঠুর সংগ্রামের মুখোমুখি হবেই—এ সিদ্ধান্তটা ভুল।

(৪) বিপ্লব আন্দোলন ছাড়াই যোগ্যতা আর কঠোর পরিশ্রমের ভিত্তিতে 'সর্বহারা' শ্রেণীও দেশের ও সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারেন। ইতিহাস বলছে : সমানাধিকারের ক্ষেত্রেও মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক দর্শন ব্যর্থ ও ভ্রান্ত।

(৫) বৈজ্ঞানিক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের ফলে বর্তমান জগতের

প্রয়োজনের গুরুত্ব অতি দ্রুত বদল হচ্ছে। এবং মার্কসীয় সেকেলে অর্থনৈতিক তত্ত্ব একালে ক্রমশঃ অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে। ইতিহাস বলছে : আধুনিক বিজ্ঞানই যখন লক্ষ সর্বহারার কাজ একটি মাত্র মেসিনে সম্পন্ন করতে পারছে, তখন সর্বহারা সংখ্যা-গরিষ্ঠতার অধিকার সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে সম্পূর্ণ অচল।

(৬) অনড় এবং অনমনীয় কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল কোন রাষ্ট্রে খুব বেশীদিন শান্তিপূর্ণভাবে চালু থাকতে পারে না। যুগোপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুঃখের বিষয় মার্কসিজমে নমনীয়তা খুব অল্প। তাই ইতিহাস বলছে : বিশুদ্ধ মার্কসিজম বর্তমান জগতের সকল আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।

(৭) মার্কসের সাইয়েনটিফিক্ সোসালিজমে শাসকবিহীন সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পনা—একটি কল্পনা বিলাস মাত্র। ইতিহাস বলছে : বাস্তবে এমন সমাজ ব্যবস্থা আজো পৃথিবীতে পয়দা হয়নি।

(৮) মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী যদি জনসাধারণের প্রত্যেককে প্রয়োজনের অনুরূপ পারিশ্রমিক দিতে হয় তাহলে সম বণ্টন ব্যবস্থার আদর্শ থাকল কোথায়? ইতিহাস বলছে : সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা একটি ভাববাদ। বাস্তব রূপায়ণ অসম্ভব।

(৯) মার্কসীয় 'সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রাম' শ্লোগানটা ধ্বনি মাধুর্যে অপূর্ব। অবাস্তবতায় মিষ্টিক কবিতার আমেজ পাওয়া যায়। ইতহাস বলছে : অর্ধেকেরও ওপর সর্বহারাই তো কিছু না কিছু বিষয় সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল। কারো কিছু কম। কারো কিছু বেশী। কাজেই সংগ্রামটা সর্বহারার সঙ্গে আধা-সর্বহারার। যেমন সংগ্রাম লক্ষপতির সঙ্গে কোটিপতির।

(১০) শ্রেণী সংগ্রাম নয়—শ্রেণী সমন্বয়ই সাজাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতির সোপান। ইতিহাস বলছে : মার্কসীয় দর্শনের শত বৎসর অতিক্রান্তের পর পৃথিবীর অধিক সংখ্যক ধনবাদী রাষ্ট্র

সর্বহারাবাদী রাষ্ট্রের চেয়ে অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান করতে সমর্থ হয়েছে।

০ চুরাশী ০

আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কার্ল মার্কসের বহু সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মার্কসের সময় (১৮১৮—১৮৮৩) সমাজে বৈজ্ঞানিক জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রথা চালু ছিল না। তাই অবাঞ্ছিত শিশুর জন্মগ্রহণ অবধারিত এবং ঈশ্বরের অবদান—এই ধরণের একটা বদ্ধমূল ধারণা পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলকেই বহুদিন মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল। মার্কসও তাই তত্ত্বগতভাবে এই সত্য মেনে নিয়েছিলেন যে সমাজের পরিমিত উৎপাদনে অপরিমিত অবাঞ্ছিত সর্বহারা জনসংখ্যার চাপ একদিন না একদিন পড়বেই। এই সর্বহারা বনাম সর্ব-গ্রাসীদের দ্বন্দ্ব একদিন বাঁধবেই। কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে এ ধারণাটা ভুল। মানুষের জন্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করতে হয় না। মানুষই মানুষের জন্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে।

তাই আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অতিরিক্ত উৎপাদন মুষ্টিমেয় বাঞ্ছিত জনগণের মধ্যে বিতরণ করা একটা অলৌকিক ব্যাপার নয়। এবং মুষ্টিমেয় বাঞ্ছিত জনগণ নিষ্ঠুর সংগ্রাম না চালিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে সুখী স্বচ্ছল সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে—এটাও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। গরীব গরীবের সঙ্গে সমঝোতায় আসা যেমন স্বাভাবিক—বড়লোক বড়লোকের সঙ্গে সমঝোতা আসা তেমনিই স্বাভাবিক। তাই নিয়ন্ত্রিত মুষ্টিমেয় বাঞ্ছিত জনগণ নিষ্ঠুর সংগ্রাম পরিহার করে নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় আসবে, আইন শৃংখলা মেনে চলবে, শান্তির পথ

অনুসরণ করবে—এইটাই স্বাভাবিক। এবং তখন মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না। পরন্তু পরিমিত শ্রমজীবিরা পাবেন আশানুরূপ পারিশ্রমিক, সুখ, স্বাচ্ছন্দ, শান্তি, সমৃদ্ধি। এইভাবে সমাজে উৎপাদন সীমার মধ্যে যদি জন্ম-নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে দারিদ্রের অস্তিত্বের ধারণাটাই হবে একটা উদ্ভট কল্পনা বিলাস। তাই অবাঞ্ছিত শিশুর জন্ম শুধু পরিবারের অভিশাপ স্বরূপ নয়—সমাজ ও রাষ্ট্রেরও অভিশাপ স্বরূপ। অপরপক্ষে বাঞ্ছিত শিশুর জন্ম শুধু পরিবারের আশীর্বাদ স্বরূপ নয়—সমাজ ও রাষ্ট্রেরও আশীর্বাদ স্বরূপ। কারণ পরিবারকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র নয়। যেমন পরিবারকে বাদ দিয়ে সমাজ নয়। সমাজকে বাদ দিয়ে দেশ নয়। দেশকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র নয়।

০ পঁচাশী ০

জীবন আর জগৎ সম্পর্কে সব কথা অথবা শেষ কথা মার্কস বলে যেতে পারেন নি। কোন পণ্ডিতই তা পারেন না। যেটুকু পেরেছেন সেইটুকুই যুক্তিবাদী মন দিয়ে খতিয়ে দেখতে হবে। দেখতে হবে সেটুকু সম্পূর্ণ নির্ভুল কিনা। জীবনের সর্বোত্তম বিকাশ তাতে সম্ভব কিনা। সকল জীবনের পক্ষে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারযোগ্য কিনা। সব দিক বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। ধৈর্য ধরে শুনতে হবে অ-মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধ সমালোচনা। এতে মাকর্সিজমের কৌলিন্য কিছুটা ক্ষুন্ন হয় হোক। জীবন মার্কসিজমের চেয়ে অনেক বড়। অনেক মূল্যবান। পৃথিবী মার্কসসিজমের চেয়ে অনেক বড়। অনেক বাস্তব। মার্কস এই পৃথিবীতে জীবনের আংশিক সুখের সন্ধান করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। পরিপূর্ণ সুখ কি? আজো তা আবিষ্কার সাপেক্ষ।

০ ছিয়াশী ০

যখনই মনে হয় মার্কসসিজম একটি নির্ভুল মতবাদ নয়—তখনই এই প্রশ্ন জাগে : তাহলে অন্যান্য পণ্ডিতদের মতবাদ কেন ধৈর্য ধরে শুনব না? কেন অসহিষ্ণু হব? মানুষ মাত্রেই যখন ভুল করেন—মার্কসও যখন ভুল করেছেন—অন্যান্য পণ্ডিতরাও যখন ভুল করেছেন—তখন একথা কেন বলব : আমি মার্কসসিষ্ট। আমিই একমাত্র ঠিক। তুমি ভ্রান্ত। তুমি আমার শত্রু। তবে কেন মানুষকে পণ্যসম্ভারের মতো একটিমাত্র কোম্পানীর ট্রেড মার্ক দিয়ে বাজারে ছেড়ে দেব? তবে কেন লেখককে একমাত্র মার্কসীয় মতবাদ প্রচার করতে বাধ্য করব? তবে কেন শিল্পীকে শুধুমাত্র প্রোলেটেরিয়টের ছবি আঁকতে বাধ্য করব? তবে কেন শিক্ষককে সরকারের প্রচারবিদের ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য করব? তবে কেন সঙ্গীতজ্ঞকে একমাত্র 'তেল নুন লকড়ীর' গান গাইতে বাধ্য করব? মানুষ তো শুধু যন্ত্র নয়—একজন চালাবে, তবে সে চলবে? মানুষের মস্তিষ্ক তো শুধু ইলেকট্রনিক ব্রেন নয়—একজন সুইচ্ টিপে ভাবাবে, তবে সে ভাববে?

তখনই ভাবি মার্কসীয় মতবাদ প্রচার করবার জন্যে সত্যিকারের সাহিত্যিকের কোন প্রয়োজন নেই। সামান্য একজন মাইনে করা নকলনবীশই যথেষ্ট। শিল্প সৃষ্টির জন্য সতিকারের শিল্পীর কোন প্রয়োজন নেই। সামান্য একজন ফটোগ্রাফারই যথেষ্ট। শিক্ষাদান করবার জন্যে সত্যিকারের শিক্ষকের কোন প্রয়োজন নেই। সামান্য একজন আবৃত্তিকারীই যথেষ্ট। সংগীত পরিবেশনের জন্য সত্যিকারের সঙ্গীতজ্ঞের কোন প্রয়োজন নেই। সামান্য একজন গ্রামোফনের রেকর্ড বাজনদারই যথেষ্ট।

তাই মনে হয় মার্কসিজম মানে যদি মানুষের সকল সৃজনী

শক্তিকে খর্ব করা হয়—আমি চাই না সে মার্কসিজম। আমি চাই মানুষের পরিপূর্ণ সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে—ব্যাক্তি স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখতে।

০ সাতাশী ০

এমন ঘটনা প্রায় সকলের জীবনেই ঘটে। সামান্য একটা কথা। কিন্তু সারাজীবন মনে থাকে সেই কথার প্রতিটি শব্দ। প্রতিটি শব্দার্থ। ব্যঞ্জনা। পাঁচ বছর, দশ বছর, পনের বিশ পঁচিশ ত্রিশ বছরেও সেই কথার দীপ্তি এতটুকু ম্লান হয় না। সুখ স্মৃতির মতো বারবার মনের আকাশটাকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। জানিয়ে দিয়ে যায় 'আমি আজো সজীব'—'আমি আজো জীবন্ত'। মনেও হয়না কথাটার বয়েস হয়েছে। কথাটা বুড়িয়ে গেছে। কথাটা হারিয়ে গেছে। কথাটা মরে গেছে।

"এত চেষ্টা করছিস গান ভোলবার জন্যে—কিন্তু গান তোকে ভুলবে না। আর এই গানের জন্যেই সারাজীবন কোন কাজে মন বসাতে পারবি না—দেখিস।"

জীবনে বারবার মর্মান্তিকভাবে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে আমার প্রথম সংগীত গুরুর ভবিষ্যৎবাণী। বারবার নিষ্ঠুর নির্দয়ভাবে যন্ত্রনা দিয়েছে সেই পঁচিশ বছর আগেকার স্মৃতির বেদনাটুকু। ভুলতে চেয়েছি। ভুলতে পারিনি। সম্পূর্ণ বিপরীত নিরস কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকতে চেয়েছি। পারিনি। কাজ থেমে গেছে। গুণগুণ করে গেয়ে উঠেছি নিজেরই লেখা গান : 'ধরা তোমায় দিলাম বলে তাই; আমার কাছে আর কি তোমার চাবার কিছু নাই?' কাজে ভুল হয়ে গেছে। গুণগুণ করে গেয়ে উঠেছি নিজেরই লেখা গান : "জীবনের পথ বকুল বিছানো নয়, আছে

নিরাশা, আছে হারাবার ভয়।” হিসেবে গড়মিল হয়ে গেছে। গুণগুণ করে গেয়ে উঠেছি নিজেরই লেখা গান : ‘যে মালা দিয়েছি কণ্ঠে তোমায় সেদিন নীরব রাতে, ছিড়িয়া ফেলোনা অভিমান ভরে আজি এ সোনার প্রাতে।’ দেনা পাওনায় দেনাই পাহাড প্রমাণ হয়ে উঠেছে। গুণগুণ করে গেয়ে উঠেছি নিজেরই লেখা গান : ‘রাত্রি এখন অনেক প্রহর হবে। বাহিরে বৃষ্টি ঝরে, মন মোর আকুল করে ; যূথিকা রিক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে সিক্ত ভবে।’

মন উধাও হয়ে গেছে কবে কোন সুদূর অতীতের প্রায় অন্ধকার সন্ধ্যায় পাড়ারই কাছাকাছি একটি ভাড়াটে বাড়ীর তিনতলার বারান্দায়। দুই বাল্যবন্ধু বসে বসে গল্পগুজব করছি। শুভাগমণ হল বন্ধুর বিদুষী শ্রীময়ী সুধাকণ্ঠি বড় বৌদির। খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। কিন্তু বিয়ের পরে হেঁসেলের চুল্লীর আগুনে তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সংসারী মানুষগুলো আজ আর সেকথা একটু ভেবেও দেখে না। সংসার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব অবহেলা করে সংগীত সাধনা একটা ছেলেমানুষী ছাড়া কিছু নয়।

ট্রে থেকে চায়ের কাপ, পাঁপড় ভাজা, মশলা মুড়ি, মোহন-ভোগের প্লেট নামিয়ে দিতে দিতে বড় বৌদি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : আজ কিন্তু তোমায় ছাড়ছি না। গান আজ তোমাকে শোনাতেই হবে। রোজ ফাঁকি দিয়ে পালাও। আজ আর সেটি হচ্ছে না।

বন্ধুবর বৌদির পক্ষ নিল : ঠিকই বলেছ বৌদি। আজ আর শনিকে ছাড়ছি না। আপত্তি করিস নে। আর তোর মুড আনবার জন্যে দেখ বৌদি নিজের হাতে চা, মুড়ি, পাঁপড়ভাজা মোহনভোগ তৈরী করেছেন। কিরে গান শোনাবি তো ?

বৌদি টিপ্পনি কাটলেন : আগে অবিশ্যি দক্ষিণ হস্তের কাজটা শেষ করে নাও। শুনেছি তোমার তো আবার মুড না এলে গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না।

বুঝতে পারলাম আমার ওজর আপত্তির সব পথ বন্ধ। জল-যোগের এমন আন্তরিক আয়োজন আর গান শোনার এমন আকুল আগ্রহ—কোনটাই উপেক্ষা করতে পারলাম না। মনে শুধু একটি ক্ষোভ নিরন্তর দংশন করতে লাগল : সত্যিই যদি আমি সঙ্গীতজ্ঞ হতাম তাহলে শ্রোতার আগ্রহ আর আকুলতা কানায় কানায় পূর্ণ করতে পারতাম। তবু সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব অসন্তুষ্টি কাটিয়ে উঠে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ রেখেই গাইলাম একটি রবীন্দ্র সংগীত : 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া, ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।' গান যখন শেষ হল সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার আশেপাশের বসে থাকা মানুষগুলোকে অনেকটা অস্পষ্ট করে তুলেছে। চোখ দুটো এতক্ষণ আমার বন্ধই ছিল। একবার তাকিয়েও দেখিনি নতুন কারা এসে সেখানে জমায়েত হয়েছে। মিনিট চার পাঁচ পর আমেজটা একটু ফিকে হতে—এই প্রথম দেখলাম নীচের তলার অল্প পরিচিত দু'একটা মুখ। সকলেই নীরব নিশ্চুপ। আর ঠিক সিঁড়ির পাশটিতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘাকৃতি আর এক বাল্যবন্ধু। সুইচটা টিপে আলোটা জ্বালিয়ে দিল সে আর বলল : অপূর্ব। অবিস্মরণীয়। অভূতপূর্ব। শনিকে আর এক কাপ গরম চা দিন বৌদি।

আমাকে লক্ষ্য করে বৌদি বললেন : শুধু গরম চা নয়—আর কি খাবে বল ?

দক্ষিণ হস্তের কাজ শেষ করতে করতে আমি বললাম : মুড তো এসে গেছে, গানও তো গেয়েছি—আর কিছু খাবার দরকার নেই

বৌদি বললেন : আবার কবে গান শোনাবে বল ?

আমি বললাম : আবার যেদিন এমনি নিজের হাতে জল-যোগের ব্যবস্থা করবেন—সেইদিন।

যদি বলি রোজ ?

ওরে বাস্—তাহলে তো আমাকে মস্ত গাইয়ে হতে হয়।

দীর্ঘাকৃতি বন্ধুবর অসহিষ্ণু হয়ে উঠল : তুই তাইই হবি।

বৌদি বললেন : ও ঠিকই বলেছে শনি।

আমি বললাম : তাহলে পড়াশুনার যে ভীষণ ক্ষতি হবে। আর পড়াশুনার ক্ষতি হলে গাড়ী ঘোড়া তো চড়া হবে না।

ধুত্তোর পড়াশুনা। নিকুচি করেছে তোর গাড়ী ঘোড়া। আয় আমার সঙ্গে। এই বলে দীর্ঘাকৃতি বন্ধুবরটি এক রকম প্রায় টানতে টানতে আমাকে নিয়ে এসে হাজির হল একেবারে রাস্তায়।

বাজখাই গলায় কিঞ্চিৎ মাধুর্য মিশিয়ে বন্ধুবর বলল : না করিস নে। কাল সন্ধ্যেতে যাবি আমার সঙ্গে।

আমার সাগ্রহ জিজ্ঞাসা : কোথায় ?

বাজখাই গলা গম্ভীর হল : তীর্থস্থানে।

পরের দিন সন্ধ্যায় দেখলাম তীর্থস্থানটি আর কোথাও নয় দর্জিপাড়ারই একটি দোতলা বাড়ীর একতলায় রাস্তার ধারের এক সঙ্গীত সাধকের গানের আসরে। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল বন্ধুবর। আসরের ছেলে-মেয়েরা চলে যাবার পর প্রাথমিক গানের পরীক্ষাও হল আমার। ঠিক হল আগামী রবিবার নেড়াবাঁধা পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করমাম : নেড়া বাঁধা কিরে ?

কোন একটা সাংঘাতিক ব্যাপারে যেন জয়লাভ হয়েছে এমনি ভাবভঙ্গি করে বন্ধুবর বলল : পরে বলব। এখন চল। ওঃ তুই আমার মুখটা রাখলি। খুব বড় মুখ করে তোর কথা বলেছিলাম। এখন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। দেখ গায়ের জোর ছাড়া সব জায়গায় সব ব্যাপারে আমি শুধু হেরে যাই—তাই এত ভয়। শনি তুই আমার মান বাড়ালি। যাক—এখন দশটা টাকা ছাড়তো।

বিস্মিত হয়ে বললাম : দশটা টাকা ? এত টাকা কোথায় পাব রে ? আর তাছাড়া কি হবে এত টাকা ?

বন্ধুবরের গলায় ক্ষোভের সুর : তুই ডোবালি। কাল নেড়া

বাঁধা পর্ব। এক হাঁড়ি রসগোল্লা লাগবে।

'নেড়া বাঁধা' ব্যাপারটাই তো এক প্রহেলিকা, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে রসগোল্লা। বেশ জটিল রসাল প্রহেলিকার সৃষ্টি হল সন্দেহ নেই। তাই কাচুমাচু মুখ করেই শুধু জানালাম : দেখ আমার কাছে এখন একটা পয়সাও নেই। তাহলে কি নেড়া বাঁধা আর রসগোল্লা কেনা হবে না?

আলবাৎ হবে—স্বাভাবিক বাজখাই গলা বন্ধুবরের—আমি এখনো জিন্দা আছি। এখন আমার কাছ থেকে দিয়ে দিচ্ছি—পরে আমায় শোধ করে দিস। তুই কিছু ভাবিস নে—কাল নেড়া বাঁধা হবেই। টাকা নেই বলে তোর গান শেখা বন্ধ হবে? কভি নেই।

রসগোল্লা ছাড়াই? আমার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। যেতে যেতে বন্ধুবরের উত্তর : না রসগোল্লা সমেত।

পরের দিন নেড়া বাঁধা পর্ব সমাপ্ত হল। অতিথি অভ্যাগতদের মিষ্টিমুখ করান হল বন্ধুবরের কেনা রসগোল্লা দিয়ে। গুরুদেব তানপুরাটা নিয়ে বসলেন। পাশে এক সাকরেদ হারমোনিয়মে সুর দিলেন। এদিকে বসে রয়েছেন বাংলার প্রখ্যাত পাখোয়াজী নন্দীমশাই। ময়দার গোলা পাকাতে পাকাতে আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বললেন : তুমি সৌভাগ্যবান—তাই গুরুর কৃপা এত সহজে পেলে। উনি বহু বছর পরে তোমার হাতে নেড়া বাঁধলেন। রোজ এখানে আসবে। কী আসবে তো?

দেখলাম চোখ দুটি নিমীলিত করে গুরুদেব তানপুরা বাঁধতে ব্যস্ত। তাই আমিও ফিস ফিস করে বললাম : রোজ এলে যে পড়াশুনার ভীষণ ক্ষতি হবে?

তা একটু হলই বা!

তানপুরায় সুর বাঁধা শেষ হয়েছে। অবিকৃত ষড়জ আর পঞ্চমের মিলিত সুর প্রবহমান স্রোতের মতো বয়ে চলেছে রিন্ রিন্ করে। নন্দী মশাইও প্রস্তুত। পাখোয়াজে ময়দা মাখানো

পর্ব শেষ হয়েছে। বোল উঠছে—ধা ধা গদি ঘেনে—

গুরুদেব বললেন : পারবে একবার শুনে একটা করে কলি গলায় তুলে নিতে?

আমি সবিনয়ে বললাম : চেষ্টা করলে হয়তো পারব।

গুরুদেব ধরলেন পূর্ব ঠাটের অন্তর্গত ধৈবত বর্জিত চৌতালে কুমারী রাগের মিঞা তানসেনের পুত্র মিঞা সুরত সেন বিরচিত একটি প্রখ্যাত ধ্রুপদ—"খরজ সুর সাধে সোই গুণী"। নন্দী মশাই পাখোয়াজে বারো মাত্রার বোল তুললেন—ধা ধা ধিন্ তা ক তাগে দিন তা তেটেকতা গদি ঘেনে—

গুরুদেব একবার সম্পূর্ণ ধ্রুপদটি গেয়ে শোনালেন—

খরজ সুর সাধে সোই গুণী
যো শুধ্ মুদ্রা, শুধ্ বাণী, শুধ্ রাগ অঙ্গ গাবে
দ্রুত মধ্য বিলম্পদ কর দেখাবে
আরোহণ অবরোহণ লাগ ডাঁট সো বাতাবে।
করত কণ্ঠ প্রকাশ, উকত যুকত অনুগ্রাণ
তব বাঢ়ত ঘটত শাস, গুরুণতে ভেদ পাবে।
কহে মিঞা সুরত সেন শুনিয়ে সব গুণীয়ন্
ধ্রুপদ বিদ্যা কঠিন, এক জনম নহি আবে।

সঞ্চারী শেষ হয়ে যাবার পর অন্তরাতে ফিরে এসে গুরুদেব আমাকে ইঙ্গিত করলেন। আমি গাইলাম—"খরজ সুর সাধে সোই গুণী"। এইভাবে সম্পূর্ণ গানটি গলায় তুলে নেবার চেষ্টা করলাম। গান শেষ হলে তিনি বললেন : তুই পারবি। ধ্রুপদের গলা আছে তোর। কিরে ছটফট করছিস কেন? অনেক রাত্রি হয়ে গেছে বুঝি? তা গান বাজনায় একটু রাত্রি হয়ই। সাধতে সাধতে রাত্রিই কাবার হয়ে যায়। রোজ আসবি। কিরে আসবি তো?

সেই একই অনুযোগ আমার : পড়াশুনার ক্ষতি হবে। রোজ এলে বাড়ীতে বকবে।

হাসতে হাসতে তিনি বললেন : তা একটু বকুনি খাবি। কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায় ? আচ্ছা আজ আয়—অনেক রাত্রি হয়ে গেছে।

এরপর প্রায় দু'মাস কেটে গেল। সামনেই পরীক্ষা। গানের রেওয়াজ প্রায় একরকম বন্ধ। অঙ্কের উত্তর মেলাতেই হিমসিম খাচ্ছি সারাক্ষণ আর দুরূহ ইংরেজি শব্দের অর্থোদ্ধার করতে অভিধান তোলপাড় করছি। মাঝে মাঝে মনটা গুণগুণ করে গেয়ে উঠতে চায়। সংযত করি। সাবধান করি। আর ভাবি পরীক্ষাটা শেষ হয়ে যাক। তারপর নিশ্চিন্ত মনে আবার সংগীত সাধনা শুরু করব। টেষ্ট পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। গেলাম একদিন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে।

আমাকে দেখেই তিনি বললেন : কিরে গান টান আজকাল সব ছেড়ে দিলি নাকি ? পরীক্ষা কেমন দিলি বল্ ?

অসহায়ের মতো গুরুদেবের পাশটিতে গিয়ে বসলাম। বললাম : খুব খারাপ। বোধ হয় গান আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।

গুরুদেব একবার পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললেন : তুই হাসালি। গান তুই ছাড়লেও, গান তোকে ছাড়বে না। এত চেষ্টা করছিস গান ভোলবার জন্যে কিন্তু গান তোকে ভুলবে না। আর এই গানের জন্যেই সারা জীবন কোন কাজে মন বসাতে পারবি না দেখিস।

বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। একি শুনলাম। এই কথাটাই তো দিনরাত্রি মনের মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রাত্যহিক কাজে—বাড়ীতে পথে ঘাটে ট্রামে বাসে সুখের দিনে দুঃখের দিনে আর্থিক সচ্ছলতায় আর্থিক অনটনে সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় রাত্রিতে সর্বক্ষণ সেই একই অতৃপ্তি “হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোন খানে”। এত চেষ্টা করছি ভুলতে। কিন্তু পারছি না। চোখের সামনে দেখছি ক্ষতি হচ্ছে। মাশুলও দিচ্ছি। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা অগোছাল হয়ে উঠছে। দেখছি। তবু গুছিয়ে উঠতে

পারছি না। বৈষয়িক উন্নতির প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছে। তবু বিষয় বাসনাটাকে জাগাতে পারছি না। শুধু অর্থোপার্জন করে বড়ো হতে মন দ্বিধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! পাঁচ জনকে একথা বলতে শুনছি। তবু উপার্জনশীল হয়ে বড়ো হবার কোন মানসিক তাগিদ অনুভব করছি না। বেশ বুঝতে পারছি ক্রমশঃ একটা স্বতন্ত্র ভাবলোক সৃষ্টি হতে চলেছে। সংসারী মানুষের কাছে যেটা শুধু উপহসনীয় নয়, নিন্দনীয়ও। তবু সেই অবাস্তব পৃথিবীটা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না।

গুরুদেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় শুধু ভাবতে ভাবতে এসেছি ঃ গান আমি ভুললেও—গান আমাকে ভুলবে না। অহরহ এই জীবন যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতেই হবে। আর এই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়াও চাই একটি বাড়তি সংসারী মানুষের অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। যা অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মতো। যার অভাবে মনের মানুষটা বাঁচতে পারে না। প্রত্যহ জলপান করার মতো, সঙ্গীত সুধা পান না করলে আমিও বাঁচব না। সংগীত আমার জীবনে সঞ্জীবনী সুধার মতো।

তাই প্রতিদিন রেডিওর চাবিটা ঘুরিয়ে দি।

শুনি রবীন্দ্রনাথের—

জাগ জাগরে জাগ সংগীত
চিত্ত অম্বর কর তরঙ্গিত
নিবিড় স্পন্দিত প্রেম কম্পিত
হৃদয় কুঞ্জ বিতানে।

শুনি চণ্ডীদাসের—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

শুনি বিদ্যাপতির—

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমনি সমাজ।
তোহে বিসারি মন তাহে সমরপল
অব মঝু হব কোন কাজ॥

শুনি জ্ঞানদাসের—

সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

শুনি গোবিন্দদাসের—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব কদম্ব॥

শুনি নরোত্তম দাসের—

ওহে নাগর বর শুন হে মুরালীধর
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ নখর মণি তনু চান্দের গাঁথুনি
ভাল শোভে আমার গলায়॥

শুনি মুকুন্দ দাসের—

ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গি মেতেছে আজ প্রলয় সঙ্গে।
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমি দ্রিমি ভঙ্গে
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।

শুনি জয়দেবের—

যদি হরি স্মরণে সরসং মনো যদি
বিলাসকলাসু কুতূহলম্।

শুনি নানকের—

সাধো, মন কা মান তিয়াগো।
কাম ক্রোধ সংগতি দুর্জন কী,
ইনতেঁ অহনিশি ভাগো।
সুখ দুখ দোনহুঁ সম করি জানৈ।
ঔর মান অপমানা।

শুনি মীরাবাঈয়ের—

হেরী মৈঁতো. দরদ দিবানী
মেরা দরদ ন জানৈ কোয়।
ঘায়লকী গতি ঘায়ল জানৈ,
কী জো ঘায়ল হোয়।

শুনি রামপ্রসাদের—

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটী কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টি কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিভাইয়ে?

শুনি কমলাকান্তের—

মজিল মন ভ্রমরা কালীপদ নীল কমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল।
দেখ, সুখ দুঃখ সমান হোল আনন্দ সাগর উথলে।

শুনি মদন বাউলের—

তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মস্‌জিদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই,—
আমায় রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে॥

শুনি দ্বিজেন্দ্রলালের—

চরণ ধরে আছি প'ড়ে একবার চেয়ে দেখিস না মা,
মত্ত আছিস আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।

একি খেলা খেলিস ঘুরে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধরে ডাকে মা মা।

শুনি রজনীকান্তের—

তব, চরণ নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যামা ধরণী সরসা ;
ঊর্দ্ধে চাই অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্জনা
সৌম্য-মধুর দিব্যাঙ্গনা, শান্তি-কুশল-দরসা।

শুনি অতুলপ্রসাদের—

বৃথা তুই ভাবিস্ মন।
ও তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা
গান গেয়ে যা আজীবন।

শুনি দিলীপকুমারের—

একলা পথের পান্থ হয়ে সব পথিকের সঙ্গ নিলে
'বাসলে ভালো মিলবে আলো সব পথেই'—এ মন্ত্র দিলে।

শুনি নজরুলের—

মহাকালের কোলে এসে
গৌরী আমার হ'ল কালী।
মুখে তাহার পড়ুক কালি
(মাকে) কালো ব'লে যে দেয় গালি।
মায়ের অমন রূপ কি হারায় ?
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্র তারায়
মায়ের রূপের আরতি হয়
নিত্য সূর্য্য-প্রদীপ জ্বালি'।
ভৈরবেরে বরণ ক'রে উমা হ'ল ভৈরবী
(মা) অভিমানে শ্মশানবাসী শিবের জটায় জাহ্নবী।
পার্ব্বতী মোর পাগলী মেয়ে
চণ্ডী সেজে বেড়ায় ধেয়ে
শ্মশান-চিতার ভস্ম মেখে
ম্লান হল মার রূপের ডালি।

শুনি এই অপরূপ সুন্দর ছন্দোময় জীবন আর পৃথিবীর নিত্য-কালের সুর তরঙ্গ। আকণ্ঠ পান করি এই দুঃখ জরা ভয় ভাবনা মৃত্যুহীন আনন্দ মদিরা—সংগীত সুধা। গুণগুণ করে গাইতে গাইতে তিন তলার ঘর থেকে নেমে আসি একতলার বসবার ঘরে—যে ঘরে চলে সারাদিন ধরে দেনা পাওনার হিসেব নিকেশ। কিন্তু বাধা পাই অর্ধাঙ্গিনীর ডাকে : শুনছ?

গুণগুণানী থেমে যায়। শুনি অর্ধাঙ্গিনীর কাতরোক্তি : সংসারের দিকে একটু তাকাও। মেয়েটার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে—আর তুমি মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে নীচে চলে যাচ্ছ। ক্যাপস্থল ফুরিয়েছে—ঝি তাগাদা দিচ্ছে দু'মাসের মাইনে বাকি—চা মিল্ক পাউডার এক ফোঁটাও নেই—রেশনের চালও বাড়ন্ত।

মুখে আর উচ্চারণ করতে পারি না : উপস্থিত টাকাও বাড়ন্ত। যেমন করেই হোক টাকা আমাকে সংগ্রহ করতেই হবে। জীবন সংগ্রামে আর পাঁচটা সংসারী মানুষের মতো আমাকেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অর্থাভাব সংসার ক্ষমা করবে না। অর্থোপার্জন আমাকে করতেই হবে। অর্থভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় সুন্দরের স্বপ্ন দেখা একটা বিলাসিতা। বিলাসিতা আমাকে ত্যাগ করতেই হবে। গান আমাকে ভুলতেই হবে। আগে সংসার—তারপর সংগীত সাধনা। আগে জীবন—তারপর জীবনের স্বপ্ন সাধনা।

তাই সান্ত্বনা দিয়ে বলি : আচ্ছা ব্যবস্থা হচ্ছে। ডাক্তারকেও খবর পাঠাচ্ছি।

কিন্তু সান্ত্বনা দিতে পারি না মনটাকে—যে মনটা প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অন্তরালে অনেকের দৃষ্টির আড়ালে তৃষ্ণাতুর অভুক্ত হয়ে একাকী পড়ে রয়েছে। তাই গুণগুণ করে গাইতে গাইতে নীচে নেমে আসি : 'বৃথা তুই ভাবিস মন, ও তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন।'

দরজা খুলে ঘরে বসতেই মনে পড়ে গেল সেই পঁচিশ বছর

আগেকার স্মৃতির বেদনাটুকু—আমার প্রথম সংগীত গুরুর ভবিষ্যৎ বাণী :

"এত চেষ্টা করছিস গান ভোলবার জন্যে—কিন্তু গান তোকে ভুলবে না। আর এই গানের জন্যেই সারাজীবন কোন কাজে মন বসাতে পারবি না—দেখিস।"

সত্যিই সেদিন সকালে ঘরে বসে কোন কাজে মন বসাতে পারলাম না। মনটা যেন শাসন সীমার বাইরে সংসারের চাওয়া পাওয়ার উর্ধে কোথায় উধাও হয়ে গেল। নীরব নিশ্চুপ অবশ পাষাণ হয়ে বসে থাকলাম অনেকক্ষণ।

০ অষ্টআশী ০

পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়।

ভালর দল মাইনরিটি। খারাপের দল মেজরিটি। চরিত্রবান শতকরা একজন। চরিত্রহীন শতকরা নিরানব্বই জন। আদর্শনিষ্ঠ হাজারে একজন। আদর্শহীন হাজারে নশো নিরানব্বই জন। উচ্চশিক্ষিত মুষ্টিমেয়। অশিক্ষিত পাহাড় প্রমাণ। বুদ্ধিমান তিলবৎ। বুদ্ধিহীন তালবৎ।

প্রশ্ন জাগে : কাকে সমাদর করব? ভাল না খারাপকে? চরিত্রবান না চরিত্রহীনকে? আদর্শনিষ্ঠ না আদর্শহীনকে? উচ্চশিক্ষিত না অশিক্ষিতকে? বুদ্ধিমান না বুদ্ধিহীনকে?

বড় মুস্কিলে পড়ি মাঝেমাঝে এই ধরণের সমস্যার সমাধান করতে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুগে সংখ্যালঘিষ্ঠকে সমাদর করব—এটা যুগ জাগৃতি অনুসারে প্রতিক্রিয়াশীলতার চূড়ান্ত বলে মনে হয়। আবার সংখ্যালঘিষ্ঠকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করব—এটাও মানবিক ন্যায় নীতি অনুসারে অমানুষিক কার্য পদ্ধতি বলে মনে হয়।

মাথাটা ভার ভার ঠেকছে। কিছুই ভাল লাগছে না। সামনের টিপয়ে রাখা রাম আর হুইস্কি একত্র পাঞ্চ করে পরম তৃপ্তি সহকারে পান করলাম। শান্তি পেলাম।

O উননব্বই O

ভোর থেকে উঠে রাত্রে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত যে বিষময় চিন্তাটা আমাকে বৃশ্চিক দংশন করে, সেটা রাজনীতি নয়, সমাজ-নীতি নয়, ধর্মনীতি নয়, প্রেমনীতি নয়, শিক্ষা নীতি নয়,—অর্থনীতি। পরিহাস করে বলা যেতে পারে এই অনর্থনীতিটিই আমার ভাবনা চিন্তার বনেদ। আমার জীবনের সুখ শান্তি স্বাচ্ছন্দ সমৃদ্ধি—সবই এই বনেদের উপর নির্ভরশীল। আমি মনে করি বনেদ যদি পাকা হয়, আমার সুখ শান্তি যদি মজবুত হয়—দেশের সুখ শান্তি আসবে। আমাকে ছাড়া তো দেশ নয়।

O নব্বই O

বাংলা দেশে পঞ্চাশ বছরের বিপ্লব সাধনার পর্বত অরাজকতার এক অতিক্ষুদ্র মূষিক প্রসব করল। বিপ্লবের নামে বাংলা দেশে যে অরাজকতার নোংরা স্রোতটা বয়ে গেল—তা অভূতপূর্ব এবং অদৃষ্টপূর্বও। এই অরাজকতার সুযোগে কিছু ধান্দাবাজ লোক তু' পয়সা কামিয়ে নিল। গরীব আরো গরীব হল। বড়লোক আরো বড়লোক হল। দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল।

অন্ধকার গাঢ় হল।

ছাত্রছাত্রীরা দাবী জানাল : পরীক্ষার হলে সকলের সামনে

বই দেখে প্রশ্নের উত্তর লিখব এবং বহু মেহনত করে যখন উত্তর লিখেছি তখন পরীক্ষায় পাশ করাতেই হবে। নইলে মেহনতী ছাত্রছাত্রীদের সসস্ত্র আক্রমণ।

বেকাররা দাবী জানাল : জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি—এ মতে আমরা বিশ্বাসী নই। আমাদের আহার জোগাবে বারোয়ারী পূজোর চাঁদার বই। সাধ্য অসাধ্য ইচ্ছা অনিচ্ছা ওসব কিছু নয়—চাঁদা দিতেই হবে। নইলে মেহনতী বেকারদের সসস্ত্র আক্রমণ।

পার্টি সমর্থকরা দাবী জানাল; রাজনীতিতে চুরী, রাহাজানি, ছিনতাই, ডাকাতী, খুনখারাপী, নরহত্যা, অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা বলে কিছু নাই। আছে শুধু যেন তেন প্রকারেণ পার্টি ফাণ্ড ভরিয়ে তোলা। কাজেই নির্বিচারে ওয়াগান আমাদের ভাঙতে দিতেই হবে, মতের মিল না হলেই মানুষকে গুম করবার গুরুদায়িত্ব অবাধে আমাদের পালন করতে দিতেই হবে, আইন অমান্যকারী হিসেবে আইনত পাকড়াও করতে হবে কিন্তু পরক্ষণেই বেআইনত খিড়কী দরজা দিয়ে পার্টির স্বার্থে বেকসুর খালাস করে দিতেই হবে। এবং এইভাবে শ্রেষ্ঠ অন্যায়কারীকে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতার আসনে বসাতেই হবে। নইলে মেহনতী পার্টি সমর্থকদের সসস্ত্র আক্রমণ।

অন্ধকার গাঢ়তর হল।

সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নাগালের বাইরে চলে গেল। বাঁচতে গেলে মানুষকে কিছু না কিছু অসৎ কাজ বা অকাজ করতেই হবে। তবে সে অস্বাভাবিক ক্রয় ক্ষমতার নাগাল পাবে। নইলে মৃত্যু। কিন্তু মরতে কে চায়? সৎ উপায়ে আয় ব্যয়ের সমতা রাখতে গেলে তাকে ট্রামে বাসে ট্রেনে মানুষের পরিচয় গোপন রেখে বাদুর পাখীর নাম গ্রহণ করতেই হবে এবং ঝুলে ঝুলে প্রাণ বিপন্ন করে অফিস আদালতে যেতেই হবে। আর বিমর্ষ হয়ে ভাবতেই হবে : এই দুঃখ কষ্ট দারিদ্র আর অসহায়তাকে

মেনে নেবার জন্যেই কি আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম? আবার আমরা পরাধীন হতে চাইছি কেন? আবার আমরা বিদেশী শক্তিকে আহ্বান জানাচ্ছি কেন? আবার আমরা বিদেশের চেয়ারম্যানকে স্বদেশের চেয়ারম্যানের গদীতে বসাতে চাইছি কেন? জীবনের স্বাভাবিক সুখশান্তি আনন্দ কারা নষ্ট করল? কারা মানুষকে শেখাল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শুধু শত্রুতার? কারা শেখাল দেশের ভরসা জাতির ভবিষ্যৎ যে তরুণ সম্প্রদায় তাদের একমাত্র অবলম্বনীয় কাজ কসাই বৃত্তি? কারা শেখাল বিপ্লবের একমাত্র অস্ত্র অরাজকতা সৃষ্টি করা? কারা সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে নিজেদের অক্ষমতা লোভসর্বস্বতা স্বার্থপরতার পঙ্ককুণ্ডে হাবুডুবু খেয়ে বিপ্লবের আসল অর্থ যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার গঠনমূলক আমূল পরিবর্তন—এ কথা ভুলে গেল? সমাজিক কুসংস্কার আর রাষ্ট্রিক অবিচারের স্তূপীকৃত জঞ্জালের একটা কুটোও সাফ করতে পারলেন না এইসব ময়ূরপুচ্ছ-ধারী বিপ্লবীরা। এই শ্লোগান-সর্বস্ব বিপ্লবীরা হামেসাই কপচাতে থাকেন: সব ধ্বংস করে ফেল। পুড়িয়ে ফেল। সবাইকে কেটে ফেল। মেরে ফেল। আর স্বগতোক্তি করেন: বাঁচিয়ে রাখো চিরাচরিত কৌলিন্য প্রথা, পৈতে আর অপৈতের রক্ষণশীল রীতি নীতি আচার ব্যবহার, অন্নপ্রাসন, উপনয়ণ, অশৌচ পালনের তারতম্য, পণপ্রথার কালো-বাজারী, বারোয়ারী পূজা, বিচিত্রানুষ্ঠানের অপ্রতিরোধ্য বেলেল্লাপনা। সমাজকে সমস্যাকণ্টকিত আর বেকারের হাহাকারে মুখরিত করে তোলবার জন্যে খুশিমত পুত্র কন্যার জন্মদান। বাঁচিয়ে রাখো: অবৈজ্ঞানিক, সভ্য মানব সমাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, কুপ্রথা। বাঁচিয়ে রাখো নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার জন্যে সমাজশত্রুদের, গুণ্ডাদের, বকাটে ছেলেমেয়েদের। চয়ে রাখো সহজ সুলভ সরল পথে অর্থোপার্জনের জন্যে রূপাজীবাদের পল্লীগুলিকে। বাঁচিয়ে রাখো অর্থদাদনকারী অতিরিক্ত সুদখোর মহাজনগুলিকে। বাঁচিয়ে রাখো পরাধীন ভারতের উপযোগী

স্বাধীন ভারতের অনুপযোগী ব্রিটিশ মহাপ্রভুদের জীবন বিধ্বংসী আইনের কচকচিগুলিকে। বাঁচিয়ে রাখো গণতান্ত্রিক সমাজবাদের অনুপযোগী একচেটিয়া অধিকারগুলিকে। বাঁচিয়ে রাখো ঘুষ, আত্মীয় তোষণ, স্বজন পোষণ। বাঁচিয়ে রাখো অধর্ম, দুর্নীতি, অবিচার, অত্যাচার। বাঁচিয়ে রাখো ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, অমানুষিকতা। বাঁচিয়ে রাখো অকল্যাণকে। বাঁচিয়ে রাখো অমঙ্গলকে।

অন্ধকার গাঢ়তম হল।

আর যেন কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আর যেন কিছুই ভাবতে পারা যাচ্ছে না। তবুও দেখতে হবে। ভাবতে হবে। বাঁচতে হবে। জীবন যে সুদূরপ্রসারী। অন্ধকার তো ক্ষণস্থায়ী। সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত। আবার শুনতে পাওয়া যায় পূর্ব দিগন্তে প্রথম আলোর চরণধ্বনি। দেখতে পাওয়া যায় জীবনকে। ভাবতে পারা যায় কল্যাণকে, মঙ্গলকে। বলতে পারা যায় : আমি বাঁচব—তোমাকেও বাঁচাব। বেঁচে থাক—বাঁচতে দাও।

০ একানব্বই ০

নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি—অনেক অসভ্যতার জবাব অহিংস পদ্ধতিতে দেওয়া যায় না। অনেক ইতরামি আর বাঁদরামির মোকাবিলা অহিংস পদ্ধতিতে করা যায় না। অনেক হিংসা, বিদ্বেষ আর ঘৃণার প্রতিবাদ অহিংসা পদ্ধতিতে জানানো যায় না।

প্রয়োজন হয় অসভ্যতার বদলে অসভ্যতার, ইতরামি আর বাঁদরামির বদলে ইতরামি আর বাঁদরামির, হিংসা বিদ্বেষ আর

ঘৃণার বদলে হিংসা বিদ্বেষ আর ঘৃণার। বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয় করতে হয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। মারকা বদলা মার দিতে হয়। লড়াইকা বদলা লড়াই করতে হয়। তবেই মনুষ্যত্ব আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নইলে যেটা থাকে সেটা ক্লিবত্ব।

সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় ক্লিবত্বের কোন স্থান নেই।

০ বিরানব্বই ০

বন্ধুরা প্রশ্ন করেন : শনি, মনুষ্যত্ব কাকে বলে ?

আমি বলি : যা জানোয়ারত্ব নয়, তাই মনুষ্যত্ব।

বন্ধুরা সন্তুষ্ট হন না। বলেন : খুলে বল। আমি খুলেই বলি : জানোয়ারেরা ভুল করে না, তাই সংশোধন করবার বালাইটাও তাদের নেই। কিন্তু মানুষ মাত্রেই ভুল করে এবং সংশোধনও করে। ভুলটা সংশোধন করবার সুযোগ দাও মানুষকে। এই সুযোগ আর সুবিধে দেওয়ার মনোভাবটাই মনুষ্যত্ব।

সব মানুষই অপরকে নিন্দে করে। কিন্তু অতিবড় নরাধমও কিছু না কিছু প্রসংশার কাজ করে। তাই নিন্দের সঙ্গে প্রসংশা করার প্রবৃত্তিটাও জাগিয়ে তোল। অপরকে প্রসংশা করার এই প্রবৃত্তিটাই মনুষ্যত্ব।

সব মানুষই দুর্বলের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। প্রভুত্ব ছেড়ে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ হও। আর এই বন্ধুত্বের মনোভাবটাই মনুষ্যত্ব।

সব মানুষই নিজের পুত্র কন্যা নিকট আত্মীয় স্বজনের কল্যাণ কামনায় নিয়ত ব্যস্ত! অনাত্মীয়ের কল্যাণ কামনার কথাও কিছুটা ভাব। সব কাজ কূপের জলে সম্ভব নয়। নদীরও প্রয়োজন আছে। আর এই বৃহত্তর স্বার্থের কল্যাণ কামনার সদিচ্ছাটাই মনুষ্যত্ব।

০ তিরানব্বই ০

বসে বসে শুনছিলাম রাজমিস্ত্রীর কথা—

কি বলব বাবু, গুণ্ডাটার জ্বালায় আমাদের ও পাড়ায় কারো খেয়ে বসে শুয়ে শান্তি নেই। নাম করা গুণ্ডা। সারা কলকাতার লোক ওকে চেনে। ভয়ও করে। আবার খাতিরও করে। ভোটের সময় কত হোমরা চোমড়া বাবু আসে ওর কাছে। যেমন গতর, খেতেও পারে তেমনি। রোজ সন্ধ্যে হলে হাতে নেয় দুটো ধেনো মদের বোতল। সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে খোলা বড় রাস্তায় মদ খেয়ে মাতলামি করে আর অসভ্য কথা বলে। সবাই দেখে। ভয়ে কেউ কিছু বলে না। পুলিশও আসে। দেখে। হাতে কি ধরিয়ে দেয় গুণ্ডাটা। পুলিশের ভ্যান চলে যায়। ও মদের বোতল ঘোরাতে ঘোরাতে পাড়ার ভেতর আসে। মুখ দিয়ে বেরোয় কাঁচা কাঁচা খিস্তি। বলে—সব শালা ঘুষখোরকা বাচ্চা—

সন্ধ্যে আর একটু থিতিয়ে এলে সব খদ্দেররা আসতে আরম্ভ করে। যত সব নেশারী জুয়ারী গুণ্ডা বদমায়েসের দল। তা বাবু দৈনিক চোরাই মদই বিক্রী করে দু'তিনশো টাকার। এছাড়া আছে বাড়ীর নিচে সাইকেল ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা। তাতেও আসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা। পাঁচ সাতখানা ট্যাক্সিও আছে। তাতেও দৈনিক চার পাঁচশো টাকা। এ ছাড়া আছে ব্লাকে সিনেমায় টিকিট বিক্রী করার ব্যবসা। চেলা চামুণ্ডারা সব তৈরী। এক টাকার টিকিট দেড় টাকায় কেনবার জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারি পড়ে যায়। এতেও রোজ ষাট সত্তর টাকা আসে। বাড়ীওয়ালা বিনা ভাড়ায় গুণ্ডাটাকে পুষছে। কখন কি দায় বিপদ হয় কে বলতে পারে। গুণ্ডাটা সব সামাল দেয়। লোকে ভয়ে বাড়ী—

ওয়ালার পেছনে লাগে না। রোজ ট্রাকে করে সন্ধ্যেতে হাজার হাজার পেটির মাল আসে। সব দেখাশুনার ভার গুণ্ডাটার ওপর। ফিসফিসানী শুরু হয়। মাল খালাস হয়ে যায়। দুম দাম করে পাড়া কাঁপিয়ে পেটি পড়ে। গুণ্ডাটার পকেটে আসতে থাকে পাঁচ টাকার দশ টাকার বিস্তর নোট। এতেও রোজ একশো দুশো রোজগার হয়। এছাড়া চেলা চামুণ্ডাদের চুরী রাহাজানি ছিনতায়ের হিস্যা। এতেও পঞ্চাশ ষাট টাকা রোজ। চেলারা বলে : ওস্তাদের আছে চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা। চোরাই মাল বিক্রীর ব্যবসা। বন্দকী কারবার। তা ফেলে ছড়িয়ে রোজ পাঁচ ছ শো টাকা। মাসে পনের বিশ হাজার টাকা বাধা রোজগার। আর বাবু, আপনারা সব লেখাপড়া শিখে কি করছেন। এ সপ্তাহে রেশনের টাকাটা কি করে জোগাড় করবেন, সেই ভাবনায় মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। বাবু, এত ভদ্রলোক হলে টাকা কামান যায় না। আর ঐ দেখুন ঐ গুণ্ডাটার পানে তাকিয়ে। ও যা ভালমন্দ খায়—আপনি রোজ তা চোখেও দেখেন না। ও যা পোষাক আষাক পরে আপনি তা পূজোতেও কিনতে পারেন না। দুটো মেয়েমানুষও পুষছে। তাদের জন্যে প্রকাণ্ড দুটো বাড়িও করে দিয়েছে। পেটে এক ফোঁটা বিদ্যে নেই। নাম সই করতেও ভাল করে পারে না। অথচ কত ভদ্রলোক, উকিল মোক্তার, পুলিশের লোক দৈনিক ওর কাছে হাত পেতে দাঁড়াচ্ছে। দুশো তিনশো বেকার ছেলেদের ও খাটাচ্ছে। মোটা টাকাও দিচ্ছে। তাই বলছিলাম বাবু—অত ভদ্রলোক হলে টাকা কামান যায় না। অত আইন বাঁচিয়ে কাজ করলেও টাকা কামান যায় না। বেআইনী হবে তো কি হয়েছে—ঘরটা তুলে দি। পরে ঝামেলা হবে সে দেখা যাবে। গুণ্ডাটাকে একটু খবর দেব। আমাকে ভালও বাসে। কলকাতার হোমড়া চোমড়া সব লোক ওর হাতের মুঠোয়। বলব আমার বাবুর কাজ। অত টাকা ঘুষ দিয়ে কাজ করাতে পারবে না। তুমি একটু দেখো।

বাবু, অত লেখা পড়া শিখলে আর ভালমানুষ হলে টাকা কামান যায় না। এখন জামানা হয়েছে অন্যরকম। গরীবের কথাগুলো একটু ভেবে দেখবেন।

রাজমিস্ত্রী চলে গেল। সারাদিন রাজমিস্ত্রির কথাগুলো কানের কাছে ফিরতে লাগল : বাবু, অত ভদ্রলোক হলে টাকা কামান যায় না। বাবু, অত আইন বাঁচিয়ে কাজ করলে টাকা কামান যায় না। বাবু, অত লেখাপড়া শিখলে আর ভালমানুষ হলে টাকা কামান যায় না।

প্রশ্ন করি নিজেকে : সত্যিই কি তাই? এ যুগে আইন শৃংখলা রক্ষা করে শিক্ষিত ভদ্র ভালমানুষ হলে টাকা কামান যায় না?

কোন সদুত্তর খুঁজে পাই না। শুধু কানের কাছে রাজমিস্ত্রীর কথাটাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে : যায় না—যায় না—যায় না বাবু।

আমি যেন রাজমিস্ত্রীর সঙ্গেই তর্ক করতে থাকি : এসব কি বলছ তুমি—তোমার কথা ঠিক নয়।

রাজমিস্ত্রীই যেন এই তর্কের মীমাংসা করে দেয় : ঠিকই বলছি বাবু। তা যদি যেত তাহলে দেশে লক্ষ লক্ষ লেখাপড়া জানা বেকার ছেলেমেয়েরা গুণ্ডামীর পথ বেছে নিত না। আজ এরা সার বুঝে নিয়েছে—অত শিক্ষিত হলে, আইন মানলে, সৎ সাধু ভালমানুষ হলে আখেরে কিছুই হবে না। বাবু, তাই এত মিছিল, তাই এত ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

০ চুরানব্বই ০

হত্যা—হত্যা। সে আবার রাজনৈতিক হত্যা, অ-রাজনৈতিক হত্যা কি? সে আবার সামাজিক হত্যা, অসামাজিক হত্যা কি? অন্যায়—অন্যায়। সে আবার গরীবের অন্যায়, বড়লোকের অন্যায় কি? ঘৃণা—ঘৃণা। সে আবার শিক্ষিতের ঘৃণা, অশিক্ষিতের ঘৃণা কি? হিংসা—হিংসা। সে আবার ব্যক্তিগত হিংসা, দলীয় হিংসা কি?

তাই বলছিলাম হত্যা—হত্যা। সে আবার রাজনৈতিক হত্যা, অরাজনৈতিক হত্যা কি? তোমার রাজনৈতিক মাপকাঠিতে হত্যা পুণ্য কাজ। কিন্তু আমার রাজনৈতিক মাপকাঠিতে হত্যা পাপ কাজ। মজা কি জান—তোমার বা আমার রাজনৈতিক মতবাদ ভগবানের সৃষ্টি নয়। তোমার আমার মতো অসম্পূর্ণ মানুষটা জীবনের সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু ভুল করে। জীবনে কখনো ভুল করেনি—এমন মানুষের সৃষ্টি কাল্পনিক। বাস্তব মানুষ ভুল করে। তাই মানুষের সৃষ্টি নির্ভুল—একথা যারা বলে তারা মানুষের মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ভগবানও ভুল করেন। নইলে কেউ রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করে, কেউ ফকিরের ঘরে জন্মগ্রহণ করে কেন? কেউ অন্ধ, কেউ চক্ষুষ্মান হয় কেন? কেউ মূক, কেউ বাক্যবাগিশ হয় কেন? কেউ বধির, কেউ শ্রুতিধর হয় কেন? কেউ বুদ্ধিহীন, কেউ বুদ্ধিমান হয় কেন? কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল হয় কেন? কেউ গৌরবর্ণ, কেউ কৃষ্ণবর্ণ হয় কেন? কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর হয় কেন? কেউ রোগগ্রস্থ, কেউ নিরোগ হয় কেন? কেউ বন্ধ্যা, কেউ সন্তানবতী হয় কেন? কেউ মানুষকে ভালবাসে, কেউ মানুষকে ঘৃণা করে কেন?

তাই বলছিলাম : এখনো পৃথিবীতে এমন মানুষের সৃষ্টি হয়নি.

এমন রাজনীতিরও পয়দা হয়নি—যা একেবারে নিখুত নির্ভুল। তাই অল্প ত্রুটিযুক্ত মানুষ আর মতবাদগুলিকে নিয়ে সমন্বয় সাধন করতে হবে। যুদ্ধ নয়। সমঝোতা আর শান্তির পথ আবিষ্কার করতে হবে। সর্বহারাবাদী আর সর্বগ্রাসীবাদী রাষ্ট্রের মানুষের সত্যিকারের কল্যাণকর প্রচেষ্টাগুলিকে সৃষ্টিমুখী করে তুলতে হবে। তোমরা যারা পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত, যারা সর্বহারাও নও অথবা সর্বগ্রাসীও নও—তারা শান্তির স্বপক্ষে আন্তরিকভাবে কিছু বল কিছু লেখ কিছু কাজ কর। মানুষের মন থেকে রাজনৈতিক মতবাদ সৃষ্ট অকল্যাণকর হিংসা ঘৃণা বিদ্বেষের মনোভাব দূর কর।

o পঁচানব্বই o

জীবনে এই প্রথম বিশ্বরূপ দর্শন করলাম। কোর্ট দেখলাম। কোর্টের মানুষগুলিকে দেখলাম। তাদের কথা শুনলাম। তাদের আচার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করলাম। বুঝতে পারলাম, জীবনটা শুধু সৎ চিৎ আর আনন্দের সমষ্টি নয়। জীবনটা অসৎ অজ্ঞান আর নিরানন্দেরও সমষ্টি। আর এই দুইয়ের সমষ্টিগত যে জীবন আর জগৎ—সেটাই কোর্ট। এখানকার মানুষগুলি অহরহ মিথ্যে কথা বলছে। ধরা পড়ছে। লজ্জা নেই। এখানকার মানুষগুলি অহরহ হিংসা বিদ্বেষ লোভ পরশ্রীকাতরতায় জর্জরিত হচ্ছে। প্রতিপক্ষ পথের ভিখিরি হয়ে যাচ্ছে। দুঃখ নেই। সমবেদনা নেই।

এখানকার মানুষগুলি বলে : কোর্ট হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র। একপক্ষ না হারলে আর এক পক্ষ জিতবে কেমন করে? এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শুধু শত্রু মিত্রের। শত্রু ঘায়েল হবে—মরে যাবে—এইটাই এখানকার সুনিয়ন্ত্রিত বাধবন্ধ নিয়ম। তাই এখানে

ভুল ভ্রান্তি অসতর্কতা অর্থহীনতার ক্ষমা নেই। এখানে প্রেম প্রীতি ভালবাসা দয়া মায়া মমতার কোন অর্থ নেই। লড়তে চাও লড়ে যাও। লড়তে না চাও প্রবলের পায়ের নীচে আশ্রয় নাও। এই ধর্মাধিকরণে মনুষ্যত্বের অর্থ—আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কূটতর্ক। সহৃদয়তার অর্থ—টাকা। ত্যাগের অর্থ—তদবির। সেবার অর্থ—ধর্মাবতার ও উচ্চতম মহলের সঙ্গে দহরম মহরম। তাই যদি তোমার কোমরের জোর থাকে—এখানে এস। যদি না থাকে—নীতি আদর্শ সত্যানুরাগ পরার্থপরতা সেবাপরায়ণতা প্রেম প্রীতি ভদ্রতা আর মনুষ্যত্বের মাতুলী গলায় ঝুলিয়ে ধর্মাধিকরণের বাইরে একাকী ক্ষ্যাপার মতো ঘুরে ঘুরে মর! না হয় 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে যাও।

ভাবতে ভাবতে ফুটপাথ ধরে চলেছি—দেখি শতছিদ্র সেলাই কলঙ্কিত কোট প্যান্ট পরিহিত মুখে কাঁচা পাকা খোঁচা খোঁচা শশ্রুগুম্ফ শোভিত ঘর্মসিক্ত ও কালিমালিপ্ত টাই কলারধারী এক উকিলবাবু আমার পথরোধ করে মর্মান্তিক বিনীত নিবেদন জানাচ্ছেন: এফিডেবিট স্যার—এফিডেবিট করবেন? সামান্য খরচা স্যার—কোন ঝামেলা নেই। কি ভাবছেন—আসুন না স্যার। আজ এখনো বউনী হয়নি। আসুন না স্যার—

হঠাৎ স্মৃতির বিদ্যুৎটা চমকে উঠলো। এসো না গো বাবু—কি অত ভাবছো—এস না। সামান্য খরচা--এসো না গো বাবু। আজ এখনো বউনী হয়নি—কানে ভেসে এল সেই দেহবিলাসিনীর কাতর নিবেদন। গত বছরের সেই দুর্যোগময় সন্ধ্যায় যখন দিকবিদিক জ্ঞান হারা হয়ে লোকজন চাদিদিকে ছুটোছুটি করছে। একদিকে মুষলধারে বোমাবর্ষণ আর একদিকে সসস্ত্র পুলিশ মিলিটারির আগ্নেয়াস্ত্র পরিচালন। নিরুপায় হয়ে আমি একটা অল্পপরিসর গলির মধ্যে ঢুকে পড়তে বাধ্য হলাম। কানের কাছে ভেসে এল সেই দেহবিলাসিনীর কাতর নিবেদন: এসো না গো বাবু—আজ সারাদিন কোন বাবু আসেনি—এখনো বউনী হয়নি।

এসো না বাবু। তাকিয়ে দেখলাম একবার মেয়েটির দিকে। পোষাক পরিচ্ছদে স্নো পাউডার লিপিষ্টিকে যৌনতাকে আকর্ষণীয় লোভনীয় করে তুলতে এতটুকু ত্রুটি রাখেনি সে। কুৎসিৎ মুখটায় বিষাদের ছায়া স্পষ্ট। শাড়ী ব্লাউজের উদগ্র নগ্নতায় আর প্রসাধনীর অতিরিক্ত ঘষা মাজায় পড়ন্ত যৌবনটা একটুও ঢাকা পড়েনি। আরো যেন বিভৎস হয়ে উঠেছে। আরো যেন কদর্য হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ মারমুখো জনতার স্রোতটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। চারিদিকে হৈ চৈ হাকডাক। সসস্ত্র মিলিটারী তাড়া করেছে। মেয়েটা আমার একটা হাত ধরে টানতে টানতে বলতে লাগল : চলে এসো বাবু—মিলিটারী আসছে—গুলী চালাবে। দরজা বন্ধ করে সে একেবারে আমাকে নিয়ে এল তার একতলার ছোট ঘরটায়। পরিবেশটা একটুও ভাল লাগল না। অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম। বললাম : তোমার ফি কত বল ?

হাসতে হাসতে মেয়েটা একেবারে পায়ে গড়িয়ে পড়ল। গায়ে লাগছে গরম নিঃশ্বাস। শরীরের সবচেয়ে কোমল অংশটা আমার ডান হাতে লেপটে দিয়ে বলল : ফি কি গো বাবু—আমরা উকিল না ডাক্তার—বেশ কথা বল গো তুমি। বেশী চাই না গো—শুধু দশটা টাকা দিয়ো। কাল বাড়ীউলী মাসীকে না দিলে, বড় মুখ করবে।

আমি দশটা টাকা বিছানায় রেখে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বন্ধ দরজা খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। জনতার কোলাহল তখন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে।

কি ভাবছেন স্যার—মাত্র দশ টাকা। এখন বলুন কি এফিডেবিট করবেন ? উকিলবাবুটির সাগ্রহ জিজ্ঞাসা। বিদ্যুৎ চমক থেমে গেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে।

এফিডেবিট ? আমি আকাশ থেকে পড়লাম : সেটা আবার কি জিনিস ?

উকিলবাবুটি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করতে লাগলেন : এফিডেবিট জানেন না? এ লাইনে নতুন বুঝি? এফিডেবিট হচ্ছে—শপথ পত্র। এই শপথপত্র দু'রকমের। এক—সত্য শপথ পত্র। যেমন ধরুণ—সত্যই আপনার নাম অমুক চন্দ্র অমুক। সত্যই বয়েস আপনার চল্লিশ। সত্যিই আপনি নিজে মামলা দেখাশুনা তদবির করছেন। এই মর্মে আপনি সত্য শপথ পত্র করলেন। দুই—মিথ্যে শপথ পত্র। যেমন ধরুণ—আপনার নাম অমুকচন্দ্র অমুক কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আপনার পিতৃদত্ত নাম পালটাতে হবে—মিথ্যা শপথ পত্র করলেন—আমার নাম আজ থেকে অমুক কুমার অমুক। বয়েস আপনার চল্লিশ কিন্তু মিথ্যে শপথ পত্র করলেন—বয়েস আপনার পঁয়ত্রিশ। মামলার আপনি বিন্দুবিসর্গ জানেন না—কিন্তু মিথ্যে শপথ পত্র করলেন—আমি মামলার সকল বিষয় অবগত আছি এবং অমুকের পক্ষে আমিই মামলার তদবির তদারক করছি। এ ছাড়া আরো হরেক রকম সত্য মিথ্যা শপথ পত্র আছে। আইনে কি না হয় স্যার? করুন না স্যার একটা এফিডেবিট? খরচ বেশী নয়—মাত্র দশ টাকা।

বক্তৃতার স্রোতে ভাঁটা পড়লে আমি উকিলবাবুটির হাতে দশটি টাকা দিয়ে আর নাম ধাম বয়েস পিতার নাম পেশা জাতি ধর্ম সব লিখিয়ে দিয়ে বললাম : আপনি টাইপ ইত্যাদি রেডি করে এখানে এসে অপেক্ষা করুন—আমি এক কাপ চা খেয়ে আসছি।

উকিলবাবুটির তখন গদগদ কণ্ঠ : আমায় বাঁচালেন স্যার—আজ শুধু হাতে বাড়ী ফিরলে গৃহিনী আর আস্ত রাখত না। আমায় বাঁচালেন স্যার।

আমি আর কোন কথা না শুনে কোন কথা না বলে সামনের ফুটপাত ধরে হন হন করে এগিয়ে গেলাম।

খুব জোরে বৃষ্টি নামল। এফিডেবিট করতে আর উকিলবাবুর কাছে যাওয়া হল না।

০ ছিয়ানব্বই ০

যখন হাতে টাকা ছিল—

তখন পৃথিবীটাকে কত সুন্দর, জীবনটাকে কত মধুময় মনে হতো। বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত কত লোকের দিবারাত্র আনাগোনা। কত মন জুগিয়ে কথা বলা। কত মহানুভবতার জয় সংকীর্তন। সুখ্যাতির কত না বৈতরণী পার হয়ে নিজের আসল কাজটুকু সেরে ফেলবার একটুও অবকাশ পেতাম না। টেলিফোনের রিসিভারটা একটু তুলে অনুরোধ করলেই কত অসম্ভব কাজই না সম্ভব হয়ে যেতো। না চাইতে না বলতেই উপহারে উপঢৌকনে ঘর দোর আমার পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো। দশজনে কান পেতে শুনত কি বলছি। অর্থহীন কথাও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতো। বহু সদগুনের বিশেষণে বিভূষিত হয়ে আমার স্বাভাবিক আমিটাকে যেন কোথায় হারিয়ে ফেললাম। মুখ ফুটে বলতে পারতাম না—ছেলেবেলার ঐ দুস্থ বন্ধুটির সঙ্গে ঘন্টাখানেক বসে গল্পগুজব করি। গুণগ্রাহী আর ভক্তদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যাই বিশ বছর আগের পার্কে যে বেঞ্চটায় গল্পের প্লটের কথা ভাবতাম সেইখানে। চলে যাই পরিচিত এই আবেষ্টনীর বাইরে ঐ কফি হাউসে। ইউনিভারসিটির গেট পেরিয়ে লইব্রেরী রুমে। চলে যাই সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা মহড়ায় ব্যস্ত ঐ এভারগ্রীন ক্লাবে। বৃদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞের ঐ অল্পপরিসর আসরে। চলে যাই অসম্ভব প্রগলভা ঐ রঞ্জনার মতো কোন মেয়ের সঙ্গী হয়ে কোন সিনেমার সর্বোচ্চ মূল্যের আরামপ্রদ কোন আসনে। কিন্তু পারি না। সময়াভাব। এপয়েনমেন্ট। এনগেজমেন্ট। সুনাম। সুখ্যাতি। সম্মান। প্রতিপত্তি। অর্থের নেশা। অর্থ জমানোর নেশা। অর্থ খরচ করার নেশা। খরচ করতে করতে জমানোর ঘর শূন্য হয়ে আসছে।

খরচের ঘর পূর্ণ হয়ে উঠছে। মানুষ বাড়ছে—খরচ বেড়ে যাচ্ছে। সৌখিনতা বাড়ছে—খরচ বেড়ে যাচ্ছে। মোহিনীদের আসা যাওয়া বাড়ছে—খরচ বেড়ে যাচ্ছে। বদান্যতা বাড়ছে—খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তারপর এল জনসেবার প্রবল আকুতি। ভোটযুদ্ধ। ভরাডুবি।

এখন হাতে টাকা নেই—

এখন পৃথিবীটাকে সুন্দর, জীবনটাকে মধুময় বলে মনে হয় না। আজ আর বাঞ্ছিত কেউ আসে না। অবাঞ্ছিতের ভীড় দিবারাত্র। কেউ মন জুগিয়ে কথা বলে না। কেউ মহানুভবতার জয় সংকীর্তন করে না। আজ চারিদিকে শুধু অবকাশ আর অকাজ। আজ টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ধরে শত অনুরোধ করলেও সম্ভব কাজও অসম্ভব হয়ে ওঠে। শতবার চাইলেও অথবা বললেও কেউ একটা পঞ্চাশ নয়া পয়সার কলমও উপহার দেয় না। দশজনে কান পেতে শোনে না কি বলছি। অর্থপূর্ণ কথাও আজ অর্থহীন। আমার স্বাভাবিক আমিটাকে আজ ফিরে পেয়েছি। আজ আর সময়াভাব নেই। এপয়েন্টমেন্ট নেই। এনগেজমেন্ট নেই। সুনাম সুখ্যাতি সম্মান প্রতিপত্তির কোন মোহ নেই। আছে শুধু প্রতিদিনের জীবন ধারণের গ্লানি। সংসারের বিরাট শূন্যতাকে ভরাট করে তোলবার নিরন্তর প্রচেষ্টা। কিন্তু টাকা নেই। নেই সেই টাকাওয়ালা মানুষগুলো, সেই গুণগ্রাহী ভক্তরা। আছে শুধু আমার একাকীত্ব। একলা সেইসব কথা ভাবছি পার্কের সেই পুরানো বেঞ্চটায় বসে বসে। ভাবছি সেই একই মানুষ এই আমি। একদিন ছিলাম। আজও আছি। শুধু নেই সেদিনের সেই আমির উদ্যম, আকাঙ্খা, প্রভাব, প্রতিপত্তি, সম্মান বোধ, প্রেম, প্রীতি, সৌন্দর্য আর সংগীত সুষমায় শ্রীমণ্ডিত জীবন দর্শন। আজকের আমি যেন সেদিনের সে আমি নই। এ যেন আমারই এক নতুন জন্ম। জন্মান্তর। আশাহীন ভরসাহীন উদ্যমহীন শক্তিহীন আর এক আমি। অল্প আলোয় দেখতে পাচ্ছি না

ঘড়িটা। বুঝতে পারছি না রাত্রি কত হল। শুধু শুনতে পাচ্ছি পথে যেতে যেতে ছেলেরা বলছে : মাইরি, লোকটা পাগল নাকি? এই এত রাতে একলা বসে আছে বেঞ্চটায়। কে যেন টিপ্পনি কাটল তাদেরই মধ্যে থেকে : নারে—ভাবুক। কবি টবি হবে বোধ হয়। দেখছিস না জামা কাপড়ের অবস্থা। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। আর একজনের টিপ্পনি : নারে—ভাবুক টাবুক নয়। কবি টবিও নয়। এ শালা হতাশ প্রেমিক।

বাড়ীতে ফিরে এসে জলের গ্লাসটা মুখে দিতে যাব—কেন জানি না টস্ টস্ করে দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল গ্লাসটার ভেতর। এক নিঃশ্বাসে গ্লাসের সব জলটুকু শেষ করলাম। আশ্চর্য হলাম। কই লবনাক্ত তো লাগল না? চোখের জলে মেশা এ জল তো লবনাক্ত নয়? এত জলে দু'ফোঁটা চোখের জলের প্রতিক্রিয়া তো কিছুই টের পেলাম না? এ যেন অনেকটা এই রকম—এতবড় পৃথিবীতে দু'চারটে মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়লে, না খেতে পেয়ে মরলে বৃহত্তর মানব সমাজে তার প্রতিক্রিয়া যেন কিছুই নয়। রাত্রির তপস্যা শেষ হয়ে আসছে। আবার সূর্যোদয় হচ্ছে। নদীর এ কূল ভাঙছে। ও কূল গড়ছে। ভাঙাগড়ার এই স্রোত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে একূল আর ওকূলকে, জীবন আর মরণকে। আমার হাতে আজ টাকা নেই। কিন্তু অন্যের হাতে তো রয়েছে। আমার ঘরে আজ আলো জ্বলেনি। কিন্তু অন্যের ঘরে তো জ্বলছে। আমার জীবন তো আজ সারা হয়ে আসছে। কিন্তু অন্যের জীবন তো শুরু হচ্ছে।

দূর থেকে ভেসে আসা রবীন্দ্র সংগীত শুনতে পাচ্ছি : 'তোমার হল শুরু—আমার হল সারা।'

o সাতানব্বই o

সেদিন এক ডিবেটিং সোসাইটির বার্ষিক বিতর্ক সভায় সভাপতি হয়েছিলাম। বিষয়বস্তু ছিল : মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্যে কোন রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ—কমুনিষ্ট না ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র? তার্কিক দুজন এম-এ ক্লাসের ছাত্র এবং ছাত্রী। ছাত্রটি নিলেন ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্রের পক্ষ আর ছাত্রীটি নিলেন কমুনিষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষ। সময় সীমা : বিশ মিনিট।

ছাত্রীটি তর্ক শুরু করলেন : আমার সুচিন্তিত অভিমত—মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্যে একমাত্র কমুনিষ্ট রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ। এই কমুনিষ্ট রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় নজির সোভিয়েট রাশিয়া। এক কথায় সোভিয়েট রাশিয়াকে বলা যেতে পারে 'সব পেয়েছির দেশ'। এখানে মানুষের সকল সত্বা সকল চিন্তা একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। এই রাষ্ট্র ধনবাদী রাষ্ট্রের বিকৃতির পুতিগন্ধময় অনাচার অত্যাচার অবিচার থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব আর বৈজ্ঞানিক রাজনীতির প্রথম অভ্যুদয় এই রাষ্ট্রেই। এখানেই প্রথম প্রতিবাদ বুর্জোয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের ভঙ্গুর চিন্তাধারার। এখানে যে নতুনতম সভ্যতার ইঙ্গিত আমরা পেলাম তা শুধু অভূতপূর্ব নয়, সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত। ধনবাদী রাষ্ট্রের অনিবার্য ফলশ্রুতি যুদ্ধ, শোষণ ও বিশ্বের সমস্ত সম্পদরাশির পুঁজিকরণ। তার বদলে এখানে আমরা পেলাম আন্তর্জাতিক উৎপাদন শক্তির সমানাধিকারের ফলশ্রুতি, চির শান্তির ফলশ্রুতি। যেদিন রাশিয়ার এই শ্রেণীহীন গণবিপ্লব বিশ্ব বিপ্লবে পরিণত হবে, সেদিন সারা বিশ্বে কমিউনিষ্ট অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সাম্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুন বিশ্বসংস্কৃতি ও নতুন শ্রেণীহীন সভ্যতার উদ্ভব হবে। সেদিন মনপ্রাণ খুলে

বলতে পারা যাবে সমগ্র বিশ্ব যেন এক নতুন মানবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করল। এখানকার সবল সুস্থ জনসাধারণের হাসিমুখ, মনোরম বিশ্রামাগার, শিক্ষালাভের অফুরন্ত সুযোগ আর উদ্যম, নিরলশ কর্মপ্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম দেখে যে কোন মানুষ আজ মুগ্ধ বিস্মিত না হয়ে পারে না। তাকে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতেই হবে ঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ভারে নিষ্পেষিত জনগণ আজ সেখানে সুখী। রাশিয়ার অবস্থা আজ সবদিক থেকে শুধু ভাল নয়, অপরের ঈর্ষার সামগ্রীও বটে।

কমিউনিজম একটি আন্তর্জাতিক মতবাদ। এই মতবাদের লক্ষ্য বিশ্বজনীনতা। তাই সাচ্চা কমিউনিষ্ট—ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদ মানে না। বুর্জোয়া সুলভ ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতাও সে মানে না। সে মনে করে ক্ষুদ্র জাতীয়তা আর প্রদেশিকতাই যুদ্ধ, অর্থনৈতিক অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর ঘৃণার জন্ম দেয়। তাই কমিউনিজমে ব্যক্তিস্বাধানতা, স্বাধীন মতামত, নিজস্ব রুচি অভিরুচি কৃষ্টি সংস্কার মূল্যহীন। ঐতিহাসিক আর ভৌগলিক কারণে কেউ বা উন্নত কেউ বা অনুন্নত। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া মনে করে—সমস্ত জাতিই সমান। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদে সকল মানুষের সমান অধিকার। তাই ঔপনিবেশিক শোষণকারী আর শোষিতদের মধ্যে যে চিরন্তন সংগ্রাম পৃথিবীতে বারবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে—কমিউনিজম সেই অনিবার্য শ্রেণী সংগ্রামের কাঠামোর জোড়গুলি খুলে দিতে চায়। পৃথিবীকে করতে চায় কলুষমুক্ত। আর মানুষকে করতে চায় মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার হাত থেকে মুক্ত। এই মুক্তির বাণী প্রথম শোনা গেল সোভিয়েট রাশিয়ায়। সরকারই এখানে কৃষিব্যবস্থার রাষ্ট্রীকরণ করে, যৌথ খামার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, জনসাধারণের জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের ঘরবাড়ী, স্কুল, বিশ্রামাগার, আমোমপ্রমোদ নিকেতন, হাসপাতাল, সংবাদপত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিচালনা করে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তির প্রথম নজির স্থাপন করেছে। তাই মানুষ এখানে সুখী সমৃদ্ধ

আর শক্তিশালী। আমার দৃঢ় অভিমত : একমাত্র কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রেই মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সম্ভব। তাই কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ।

এবার ছাত্রটি তর্ক শুরু করলেন : আমার সুদৃঢ় অভিমত—মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্যে একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা আমেরিকাকেই দিতে হয়। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় সম্পদ মানুষ এখানে স্বাধীন। এখানে ব্যক্তি, সমষ্টি ও জাতির আশা আকাঙ্খা স্বৈরতান্ত্রিক জবরদস্তিতে আর জীবন বিরোধী যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ম্রিয়মান মুহ্যমান নয়। যথার্থ ন্যায় আর মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা এখানেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু শ্লোগান সর্বস্ব সোভিয়েট রাশিয়ায় মানুষের মর্যাদা ও মনুষ্যত্ব ভূলুণ্ঠিত। সেখানেও দোষ বুর্জোয়া পরিকল্পিত সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, বিশেষ সুবিধাভোগী ও বঞ্চিতদের ব্যবধান, সামাজিক বৈষম্য, কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে সাধারণের অল্প উপার্জন, অপরিচ্ছন্ন ও বর্ণহীন পোষাক পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী, দোকানের নিম্নশ্রেণীর জিনিষপত্র, সামান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনবার জন্যে সাধারণের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। সেখানে নেই সাধারণের সমালোচনা করবার অধিকার, স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবার অধিকার। স্বাধীনতা সেখানে অসহ্য। দাসত্বই সেখানে মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র যোগ্যতা। সেখানে বিরোধী দল বলে কিছু নেই। সেখানে সরকারের তোষামোদ আর ওপরওয়ালাদের পদলেহন করা ছাড়া বাঁচবার দ্বিতীয় কোন সম্মানজনক পথ খোলা নেই। সেখানে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে এক দুর্বোধ্য প্রাচীর। সেখানে পার্টির অগণিত সাধারণ সভ্যরা মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় চাটুকার আমলাতন্ত্রী আর তাঁবেদার বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিদের খেয়াল খুশির কথা জানবার কোন সুযোগই পায় না। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবার, কোন কথা লেখবার উপায়ও নেই। রাষ্ট্র

নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে না পারলে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিককেও সেখানে কারারুদ্ধ হতে হয়। বিনা বিচারে কেউ না কেউ সেখানে লাঞ্ছনা ভোগ করছে, নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। কেউ বা গুপ্তচরের অভিযোগে গুলি খেয়ে মরছে। কেউ বা চিরতরে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে কেউ এইসব দুর্ভাগাদের কথা মুখে উচ্চারণ করে না। সর্বত্রই সেই স্বৈরতন্ত্রী জুজুর ভয়। কারণ সেখানে স্বৈরতন্ত্রই সর্বেসর্বা। কিন্তু স্বৈরতন্ত্র কোনদিনই গণতন্ত্র হতে পারে না। তাই সেখানে বুদ্ধির স্বাধীনতা ব্যাহত। সেখানে শুধু একটিই নির্দেশনামা : আদেশ পালন কর—কিছু জিজ্ঞেস করো না, কিছু বুঝতে চেয়ো না—শুধু নত শিরে আদেশ পালন কর।

এই উৎপীড়ক সমাজ ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু নির্যাতিতদের খবর কেউ রাখে না। সেখানে সকলে একই ভাবে চিন্তা করে বা চিন্তা করতে বাধ্য হয়। তাই কাগজে কলমে এখানে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে সাধারণ মানুষ থেকেই এক নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর মতই এদের আচার ব্যবহার কথা বার্তা ভোগ সুখ। দারিদ্র থেকে মুক্তিলাভ করে আজ তারাই দরিদ্রকে ঘৃণা করে। দেশের ভোগ্যপণ্য সামগ্রী বেশীর ভাগ এদেরই করায়ত্তে। তাই এখানেও সেই পুরোনো ধনবাদী শোষণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। মানুষকে ক্রীতদাস করার নবতর জঘন্য উপায় উদ্ভাবন করেছে এই দেশের কমিউনিজম। একদিন যে বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী থেকে যুদ্ধ, দারিদ্র আর দুঃখের অবসান করা—আজ কোথায় সে উদ্দেশ্য আর আদর্শ? কিন্তু আমেরিকায় আজ কোন মানুষ ক্রীতদাস নয়। মানুষের মর্যাদা আর মনুষ্যত্ব আজ এখানে প্রতিষ্ঠিত। আজ এখানে একজন শ্রমিকেরও একটি মোটর গাড়ী, একটি টেলিভিশন সেটও আছে। এখানে সরকার বিরোধী পার্টিও আছে। এখানে সুবিচার আছে, স্বাধীনতা আছে, সমালোচনা আছে। এখানে যে কোন

মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে উচ্চ শিক্ষালাভ করে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারে। চিন্তা স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, মতবাদ পোষণ করার স্বাধীনতা এখানে অবাধ। আমেরিকার সবচেয়ে বড় সম্পদ একতা, ভ্রাতৃত্ব আর স্বাধীনতা। তাই পৃথিবীতে সত্যিকারের 'সব পেয়েছির দেশ' আমেরিকাকেই বলা যায়। মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ এই রাষ্ট্রেই সম্ভব। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ।

এবার আমার রায় দেবার পালা। উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করলাম এই বলে : আজকের এই বিতর্ক সভার বিষয়বস্তুটি খুবই জটিল, গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশদ আলোচনা সাপেক্ষ। বিশ মিনিট সময় সীমার মধ্যে এমন এক জাগ্রত যুগচিন্তার ফয়সলা করা শুধু দুরূহ নয়—অসম্ভব। কাজেই জয় পরাজয়ের চুলচেরা হিসেব নিকেশ না করে—তর্কের মূল সূত্রটিরই বিচার বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি। এখন প্রশ্ন : এই মূল সূত্রটি কি? উত্তর : মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় : কোন মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ? তার উত্তরে স্বতঃই যে কথা মনে আসে তা হচ্ছে—সেই মানুষ যে মানুষ মহামানবদের মতবাদ-আদর্শ-সর্বস্ব হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। শুধু স্বাধীন সুস্থ সবল কর্মঠ হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে যে মানুষ। যে মানুষ তার জন্মগত অধিকার ব্যক্তিত্ব আর মনুষ্যত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। যে মানুষ অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের পারিবারিক, সামাজিক আর রাষ্ট্রিক কর্তব্য পালন করে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে চেয়েছে। শুধুমাত্র রাষ্ট্রিক মানুষ হয়ে উঠতে চায় নি। মানুষের জীবন তো শুধু মতবাদ সর্বস্ব নয়। মানুষই মতবাদ সৃষ্টি করেছে। মতবাদ মানুষকে সৃষ্টি করেনি। তাই রাষ্ট্রের কর্তব্য—অনড় অচল মনুষ্যসৃষ্ট মতবাদকে ভেঙে চুরে কিছুটা গ্রহণ কিছুটা বর্জন করে যথাসম্ভব নমনীয় করে জীবন উপযোগী সর্বাঙ্গীন কল্যাণকর করে গড়ে তোলা। আর এই রাষ্ট্রকে পরিচালনা করবে মানুষ। রাষ্ট্র তো যন্ত্র। মানুষই

যন্ত্রী। তাই কল্যাণ রাষ্ট্রে প্রত্যেক মানুষকেই হয়ে উঠতে হবে উচ্চশিক্ষিত, সুদক্ষ, সৎ, কর্মবীর, স্বাস্থ্যবান, অর্থবান, বিচার বুদ্ধি বিবেচনা কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন। মন থেকে মুছে ফেলতে হবে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, কূপমণ্ডুকতা, ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা, পরশ্রীকাতরতা আর সর্ববিধ সংকীর্ণতা। এমন দুরূহ কাজ এককভাবে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষে বা ধনবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কাজ সম্ভব একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে। আর এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্রের প্রথম প্রয়াস হবে পৃথিবীর সকল বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের মানুষের জন্মকে সুনিয়ন্ত্রিত করা। যুদ্ধ, হিংসা, অশান্তি, বিদ্বেষ, ভূমি ক্ষুধাকে ইতিহাসের বহু পুরাতন ছেঁড়া পাতার সামগ্রী করে তুলতে হলে—গরীব বড়লোকের এই কৃত্রিম দ্বন্দ্ববাদ-টাকে চিরতরে কিংবদন্তীর দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্রকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে বর্ধিত জন্মহারকে নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। আর পৃথিবীর মানুষকে এই উচ্চাশা পোষণ করতে হবে—একমাত্র অভিপ্রেত সুনিয়ন্ত্রিত পরিমিত ধনবান স্বাস্থ্যবান উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান জনগণই একদিন পৃথিবীকে সত্যিকারের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করবে। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে কোন মানুষ আর সেদিন স্বর্গে যেতে চাইবে না। কেউ বলবে না : এ জীবন নিশার স্বপন। এ জীবন শুধু দুঃখময়, কষ্ট আর যন্ত্রণার গুরুভার। এই জীবন আর এই পৃথিবী থেকে মুক্তি চাই আমি। বলবে : আমি বাঁচব—আমি ভোগ করব।

এই দিক থেকে বিচার করে আমি আজকের এই সভায় ঘোষণা করছি—ছাত্রটিই প্রকৃত জয়মাল্যের অধিকারী। কারণ হিসেবে বলতে পারি- ধনবাদী গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের লক্ষণা-ক্রান্ত।

সভায় তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হল। আমি ধীরে ধীরে সভাপতির আসন ত্যাগ করে বাইরে অপেক্ষমান গাড়ীতে উঠে বসলাম

স্ত্রী বললেন : একি করলে ?

আমি সিগারেটটা ধরিয়ে শুধু বললাম এক পক্ষকে তো জয়ী করাতেই হবে—তাই।

০ আটানব্বই ০

এক বক্তৃতাবাগিশ মার্কসিষ্টের পাল্লায় পড়েছিলাম। টাকার অভাবে মনটা খাবাপ—একথা জানাতেই ভদ্রলোক যেন বীর বিক্রমে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন : ওসব মনটন কিছু নয়। পুরোনো অভ্যাসের বদহজম : দয়া মায়া স্নেহ প্রীতি ভাব ভালবাসা—ওসব বুর্জোয়া কুসংস্কার। মন বলে কিছু নেই—সব ম্যাটার। এভরিথিং ইজ ম্যাটার ভায়া।

বলেই ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। পিঠ চাপড়ে বললেন : মাঝে মাঝে এসো ভায়া। অনেক কিছু জানতে পারবে। ভাবের জগতে অনেক জঞ্জাল জমা হয়েছে। প্রকৃত মার্কসিষ্টের কর্তব্য এইসব জঞ্জাল পরিষ্কার করে মানুষের ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দকে বাড়িয়ে তোলা। পৃথিবীকে গ্লানি মুক্ত করা।

ভদ্রলোকের কথাগুলো মনটাকে নাড়া দিল। সত্যিই তো বস্তু ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কি আছে ? বস্তু থেকেই ভাব। ভাব থেকে আবার সেই বস্তুরই রূপায়ণ। কাজেই বস্তু ছাড়া কোন ভাবের কল্পনাও তো করতে পারি না আমরা। পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে স্তব্ধ করে কোন ভাবের অনুশীলনও সম্ভব নয়। ফুল ফুটেছে। দেখতে ভাল লাগছে। তার সুঘ্রাণ পাচ্ছি। স্পর্শে আনন্দানুভূতি। সব জড়িয়ে একটা কবিতাময়ী ভাবমূর্তি। কাজেই ভাবের আধার সেই বস্তু—সেই ফুল।

গেলাম অনেক দিন পর সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে। অবাক

হয়ে গেলাম ভদ্রলোককে দেখে। একি চেহারা হয়েছে? মাত্র মাসখানেকের ব্যবধান। আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে নীরব নিশ্চুপ হয়ে একলা ঘরে বসে আছেন। এই কদিনে তিনি যেন অনেকখানি বুড়িয়ে গেছেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। আমাকে দেখলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। শুধু ইঙ্গিতে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

চেয়ারটায় বসে আমিই প্রথম মৌনতা ভাঙলাম : কি ব্যাপার? শরীর খারাপ নয় তো?

স্থির গম্ভীর কণ্ঠস্বর মার্কসিষ্টের : শরীর ঠিক আছে। মনটা ভীষণ বিচলিত হয়েছে। আজ আমার স্ত্রীর মেজর অপারেশন। এখনি যাব হসপিটালে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে ভায়া। কি যে হবে ভাবছি তাই।

মন? মার্কসিষ্টের মন খারাপ? কড়া ভোল্টের ইলেকট্রিক শক খেয়ে আমার দেহমন যেন মুহূর্তে নিস্তেজ অবশ নিস্পন্দ হয়ে গেল।

আজও আমার মনের আকাশে সেই মার্কসিষ্টের সেদিনের সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বলে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আর কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করছে মার্কসিষ্টের সেই কাতরোক্তি : "মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে ভায়া।"

০ নিরানব্বই ০

অদ্ভুত এক পরিস্থিতির মধ্যে আজ আমরা বসবাস করছি। পরিষ্কার বুঝতে পারছি রাজনৈতিক মাতব্বররা মানবিক নীতি আদর্শকে প্রাধান্য না দিয়ে—পার্টিকেই বড় করে দেখছেন। ফলে পার্টির নীতিহীন আদর্শহীন গুণ্ডা বদমায়েস খুনী জহ্লাদরূপী

সদস্যটাই মানবিক নীতি আদর্শকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। পার্টিহীন মানুষগুলো ভয়ে ত্রাসে জবুথবু। বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেশটা বিনা চিকিৎসায় মৃতপ্রায় রোগীর মতো তিলে তিলে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি লাভ করুক—এইটাই হয়তো বর্তমানের পাওয়ার সর্বস্ব উশৃঙ্খল রাজনৈতিক মাতব্বরদের আন্তরিক ইচ্ছা। দেশটা উচ্ছন্নে যায়, যাক—ক্ষতি নেই। আখেরে নিজের জন্যে কিছু গুছিয়ে নিতে হবে। নিজে বাঁচলে তবেই পিতৃনাম। পার্টি বাঁচলে তবেই ছুটো পয়সা। নীতি, আদর্শ, মানব প্রেম, দেশ সেবা—ওসব অর্থহীন ফাঁকা বুলি। নীতি আদর্শ কি ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়াবে? মানব প্রেম কি পাওয়ার দেবে? দেশ সেবা কি পঞ্চ "ম"কারকে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দেবে?

না।

তাইতো সম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস আজ তিন ভাগ। কমিউনিষ্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোসালিষ্ট পার্টিগুলি আজ কমপক্ষে দু'ভাগ। অথচ আমরা স্বপ্ন দেখছি এক জাতি এক প্রাণ একতার। স্বপ্ন দেখছি ওয়ান ওয়ার্ল্ডের। তাইতো আজ ডানপন্থী আর বামপন্থীর কোঁদল 'কথামালা' আর 'হাসি-খুশির' চুটকি মস্করা। তাইতো আজ বুর্জোয়া প্রোলেটেরিয়টের সংগ্রাম 'ঠাকুরমার ঝুলি'র উপকথা। তাইতো আজ ডি. এল. রায়ের ঢঙে বলতে ইচ্ছে হয়:

সত্য সেলুকাস!
কি বিচিত্র এই দেশ!!
কি বিচিত্র এই দেশের পলিটিক্যাল পার্টিগুলো!!!
কি বিচিত্র এই দেশের পলিটিক্যাল পার্টির পাণ্ডাগুলো!!!!

এইসব পাণ্ডারা দেশের কল্যাণ করা ছাড়া আর সব কাজেই সিদ্ধহস্ত। এরা কি না পারে! এক পার্টিকে দু'পার্টিতে, দু'পার্টিকে চার পার্টিতে, চার পার্টিকে আট পার্টিতে একদিনে রূপান্তরিত করে দিতে পারে। ভানুমতির খেলা এদের কাছে

এক টিপ্ নস্যি মাত্র। পার্টির লেবেল এঁটে এরা একদিনে পাঁচশো লোকের মুণ্ডু কেটে দিতে পারে। দেশের ছোট মাঝারী বড় পাঠশালা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় একদিনে বন্ধ করে দিতে পারে। ষাট মিনিটে দেশের সব হাসপাতালগুলিকে রোগীশূণ্য করে দিতে পারে। তিরিশ মিনিটে সংবাদ পত্রের, দুগ্ধ সরবরাহের ভ্যানগুলিকে পুড়িয়ে দিতে পারে। বিশ মিনিটে ট্রাম বাস ট্যাক্সি জ্বালিয়ে দিতে পারে। পনের মিনিটে বার থেকে ষোল বছর বয়েসের ছেলেমেয়েদের মুখে আদি রসাত্মক কথার তুবড়ী ছুটিয়ে দিতে পারে। দশ মিনিটে মহল্লার নিরীহ অধিবাসীকে বোমার পিলে চমকানো শব্দে সচকিত চমকিত করে দিয়ে ঘর ছাড়া পাড়া ছাড়া করে দিতে পারে। ন' মিনিটে দোকান পাটের ঝাঁপি বন্ধ করে দিতে পারে। আট মিনিটে পথচারীর সর্বস্ব ছিনতাই করে নিতে পারে। সাত মিনিটে বারোয়ারী পূজোর চাঁদার খাতায় সাতশো টাকা তুলে দিতে পারে। ছ'মিনিটে পরীক্ষার হলে বই খুলে প্রশ্নের পুরো উত্তরটা টুকে দিতে পারে। পাঁচ মিনিটে ব্যাঙ্কের বিশ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে নিতে পারে। চার মিনিটে পুরো এক বোতল কারণবারি পান করে নিতে পারে। তিন মিনিটে জলজ্যান্ত মানুষটাকে কিডন্যাপ করে দিতে পারে। দু'মিনিটে লোকালয়ের সব আলো-গুলো নিভিয়ে দিতে পারে। এক মিনিটে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে দিতে পারে।

এরা সব পারে সেলুকাস!

পারে না শুধ কিছু গড়তে।

○ একশো ○

মানুষকে ভালবাসতে শেখো। মনুষ্যত্বকে ভগবানেরও ওপর স্থান দাও। হিন্দু মানুষ, মুসলমান মানুষ, খৃষ্টান মানুষ, বৌদ্ধ মানুষ, জৈন মানুষ, শাক্ত মানুষ, বৈষ্ণব মানুষ, আমেরিকান মানুষ, রাশিয়ান মানুষ, চাইনিজ মানুষ, ইংরেজ মানুষ, জার্মান মানুষ, বাঙালী মানুষ, অ-বাঙালী মানুষ, ব্রাহ্মণ মানুষ, চণ্ডাল মানুষ, নিগ্রো মানুষ, সাঁওতাল মানুষ, কংগ্রেস মানুষ, কমিউনিষ্ট মানুষ, সাদা মানুষ, কালো মানুষ, চরিত্রবান মানুষ, চরিত্রহীন মানুষ, বড়লোক মানুষ, গরীব মানুষ—এভাবে শ্রেণী বিচার করে নয়। মনুষ্যত্বে আর মানবিক সম্পদে ভরপুর এমন মানুষকে ভালবাসতে শেখো। আর তুমি চরিত্রবান অহিংস ধনকুবের হিন্দু ব্রাহ্মণ কংগ্রেসী সাদা চামড়ার মানুষ—বুঝতে শেখো—চরিত্রবান সহিংস গরীব মুসলমান অ-ব্রাহ্মণ অ-কংগ্রেসী কালো চামড়ার মানুষের মাতৃবিয়োগের মর্মযাতনা। তেমনি খৃষ্টান মানুষ বুঝতে শেখো নিগ্রো মানুষের পিতৃবিয়োগের দুঃখ বেদনা। তেমনি শাক্ত মানুষ বুঝতে শেখো বৈষ্ণব মানুষের সন্তান বিয়োগের শোকাকুলতা। দেখবে দুঃখ কষ্ট বেদনা যাতনা রোগ শোক ভয় ভাবনা—সর্বোপরি মৃত্যুর কোন জাত নেই, শ্রেণী নেই। এখানে সব মানুষ এক—শ্রেণীহীন। এখানে সব মানুষই সমান। এখানকার সব মানুষের মনই খুঁজে ফিরছে মানুষের সেবা সাহচর্য, সান্ত্বনা, পরদুঃখকাতরতা, সহায়তা আর সহানুভূতি। প্রত্যেকটি মানুষ মনুষ্যত্বের এমনি কত উচ্চ প্রবৃত্তির আহ্বান জানাচ্ছে প্রতিনিয়ত। মনুষ্যত্বের এই সমতল ভূমিতে তোমাকে নেমে আসতে হবে। গর্ব অহংকার শক্তিমত্ততা হিংসা বিদ্বেষ—সব ত্যাগ করতে হবে। দেখবে ভৌগলিক সীমার উর্ধে মানুষের মন এক। মানুষ অভিন্ন। মানুষের শুধু একটাই

প্রবৃত্তি—ভালবাসা। সব মানুষই যে ভালবাসার কাঙাল।

কিন্তু সাবধান। এই ভালবাসার কোন জাত সৃষ্টি করো না। কোনো শ্রেণী সৃষ্টি করো না। শুধু মানুষকে ভালবাসো। আর মানুষের ভালবাসাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে গ্রহণ করো।

এই শ্রেণীহীন ভালবাসা—প্রেমই আমার কাম্য। আর এই ভালবাসার নতুন জগতের বাসিন্দা হোক প্রেমিক প্রেমিকারা—এই আমার প্রত্যাশা। আর কামনা এই শ্রেণীহীন প্রেমিক প্রেমিকারাই গড়ে তুলুক এক নয়া সমাজ ব্যবস্থা—এক নয়া সমাজতন্ত্র। গড়ে তুলুক এক নয়া গণতান্ত্রিক সমাজবাদ।

অ.

দি

ে